KuinEu
Khulna UniversityGraduate in Europe

www.kuin.eu

শেকড়ের টানে

For the Roots

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সূচিপত্র

আমাদের কথা

আমার স্বপ্নের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

– *ডঃ গোলাম রহমান, প্রথম উপাচার্য*

আমাদের প্রজন্ম

বিজ্ঞান ও দর্শন

- বদলে দাও পৃথিবী
- দুর্নীতির কলঙ্ক ঘুচিবে কবে?
- কানু মামার সাথে ঘোরাঘুরি
- সর্বোচ্চ শিখরে নয় সফলতা -সফলতা হোক জীবনের আত্মতৃপ্তিতে

সমাজ ও অর্থনীতি

- সোহেল মামা
- গল্পের গল্প

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

- লোহার টুকরা
- শুধু দেখব তোমায়
- অহংকারের একুশ আমার
- সম্পর্কের ভূচিত্র
- যাপিত জীবন
- মহাজাগতিক ভণ্ডামি
- সময়
- করোনা ১৯
- পথিক
- অভিসার

রসনাবিলাস

- রাশিয়ান গাজর সালাদ
- চিকেন কোরমার রেসেপি
- আঙ্গুরের খাঁটা
- সেমাই পিঠা

ভ্রমণকাহিনী

- থ্রি মাস্কেটিয়ার্স

সম্পাদকমণ্ডলী

শুভ, নগ্রাপ ৯৪

রবিন, বিবিএ ৯৪

সজীব, নগ্রাপ ৯৯

মফিজ, ইএস ০০

প্রচ্ছদ অঙ্কন ও পরিকল্পনা

তৌহিদ, স্থাপত্য ৯১

স্বত্বাধিকারী

KUinEU

আমাদের কথা

আমাদের প্রাণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, আর হৃদয়ে বাংলাদেশ। আমাদের এই প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় -এর যাত্রা ১৯৯১ থেকে। রোজ সকালের কালো কফির কাব্যমালায় যেমন সময় থমকে দাঁড়ায় না - এলোমেলো ভাবনাতে নতুন করে আশার আলো জ্বালাতে ইউরোপে অবস্থানকারী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা আজ শিকড়ের সন্ধানে একাত্ম। তারই সূত্র ধরে আমাদের প্রথম প্রয়াস ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমাদের এই পথ চলা শুরু।

জীবনের অনেক সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও, মনের কোণে জমে থাকা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি আমাদের সেই অনুভূতির দেশে ফিরিয়ে এনেছে। কত অজানা গল্পের গল্প আজ হৃদয়ে অহংকারের ঝড় তোলে, চোখের কোণ ভিজে উঠে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের ডাক শুনার অপেক্ষায়। তারই কিছু সংকলন নিয়ে আমাদের এই প্রথম নিবেদন - আমরা কেউ কবি নই , কেউ ছড়াকার নই - কিংবা নই কেউ উপন্যাসিক। কলমের কালিতে মাতৃভাষা দিবসে আমাদের হৃদয়ের যে অনুভূতি আমরা এখানে তুলে ধরেছি তা নিতান্তই ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি - একান্তই আমাদের মনের কল্পনায় শিকড়ের সন্ধানে।

কিভাবে শুরু হলো আমাদের পথচলা? সারা বিশ্বে সকল মানুষ যখন এক অজানা ভাইরাস ভয়ে আতঙ্কিত, আমরা সবাই যখন গৃহবন্ধ - তখন সবাই যেমন কাছের মানুষদের খুঁজে ফিরেছে - আমরাও আমাদেরকে খুঁজেছি - কাছে ডেকেছি - সবার সাথে মেতে উঠেছি পাশে থাকার গল্প শুনতে - সবাই কে নিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে। প্রতি ১৫ দিন পরপর সকল কাজ ফেলে আমরা বসে যাচ্ছি সেই স্মৃতিচারণ করতে - নিজেদেরকে খুঁজে ফিরতে, আর আগামী দিনগুলা সুন্দর করে সাজাতে, স্বপ্ন দেখতে।

আমাদের সকল গল্প ঘিরেই থাকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি - এ এক অন্যরকম অনুভূতি - "বন্ধু কি খবর বল?" মনে হয় যেন আমরা সবাই আবার ক্যাম্পাসে - এ যেন সেই শিকড়ের টান - যা আমাদের একীভূত করে তোলে।

আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো ভেসে উঠে সবার গল্পে - যেন কল্পনায় দেখে ফেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলো, যেখানে সহপাঠী, শ্রদ্ধেয় বনধুপ্রতিম শিক্ষকমণ্ডলী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, সবাই একটি পরিবার। অন্তরে শিকড়ের টান আর তাই সুখ দুঃখের সাথী, প্রিয় বন্ধুদের ভালোবাসা এখনও অকৃত্রিম - যা ছিল, আছে ও থাকবে। প্রিয় মানুষগুলো নিয়ে আমাদেরকে ভাবায় সেই শিকড় - আমাদের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই প্রচেষ্টায় যারা আমাদের সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছেন তারা হলেন আমাদের সবার পরিবার, আমাদের সবার বাবা-মা, ছেলেমেয়ে - আমাদের সবার জীবনসঙ্গী। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ ছাড়া আমরা কেউ এই বিদেশ-বিভুঁয়ে টিকতে পারতাম না, ভাবতেই পারতাম না ফিরে দেখা সময়ের গল্প জমাতে। তাই তাদেরকেই জানায় আমাদের শুভকামনা - আমাদের এই প্রচেষ্টা যেন তাদেরকেই দিতে পারে নিজস্ব জীবনের গন্ডির বাইরে আরো একটি সুন্দর পরিবার।

যাকে বাদ দিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কল্পনা করা যায় না, সেই জ্ঞানী পথপ্রদর্শক, আমাদের প্রথম উপাচার্য, শ্রদ্ধেয় প্রফেসর গোলাম রহমান স্যার-এর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দিকনির্দেশনা আমাদেরকে এই প্রয়াসে আরো উৎসাহী করেছে। আমরা তার প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ - সকল শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে আমরা তার সুস্থ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। পাশাপাশি আমাদের আমাদের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত সবার আমাদের জীবনে যে অবদান তা অনস্বীকার্য, আমরা তাদের সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সর্বোপরি আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা ছবি এঁকে, কবিতা লিখে এই প্রথম প্রয়াসকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের কাছে আমাদের ঋণের সীমা নেই। বিদেশ জীবনের কর্মব্যস্ততার মাঝেও যারা গল্প, কবিতা, কিংবা প্রবন্ধ, রকমারি রান্না ও ভ্রমণকাহিনী লিখে আমাদের এই সাময়িকী প্রকাশে পাশে দাঁড়িয়েছেন, আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সময়ের স্বল্পতায় সবার কাছ থেকে লিখা সংগ্রহ না করতে পারার জন্যেও

অপারগতা স্বীকার করছি। পরবর্তী সংখ্যায় আপনাদের কাছ থেকে আরো স্বতঃস্পুর্ত অংশগ্রহন আশা করছি।

আমরা চাই এই "শিকড়ের টানে" সাময়িকী-র মাধ্যমে আমাদের সফলতা ও জীবন যুদ্ধের গল্প সবার কাছে পৌঁছে দিতে - আমাদের পরিবারের সুখ-দুঃখ বিনিময় করতে - সুন্দর করে বেঁচে থাকতে।

আমাদের এই প্রথম প্রয়াসে অনিচ্ছাকৃত অনেক ভুল ত্রুটি আছে, আপনাদের মতো বিচক্ষণরা যা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলেই আমাদের একান্ত কাম্য। আমাদের পরবর্তী সংখ্যায় এই সকল অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি শুধরে নিবার অভিপ্রায় রইল।

আমাদের এই প্রথম প্রয়াস সকল ভাষা শহীদদের উদ্দ্যেশে উৎসর্গ করছি।

ধন্যবাদান্তে
সম্পাদকমণ্ডলী

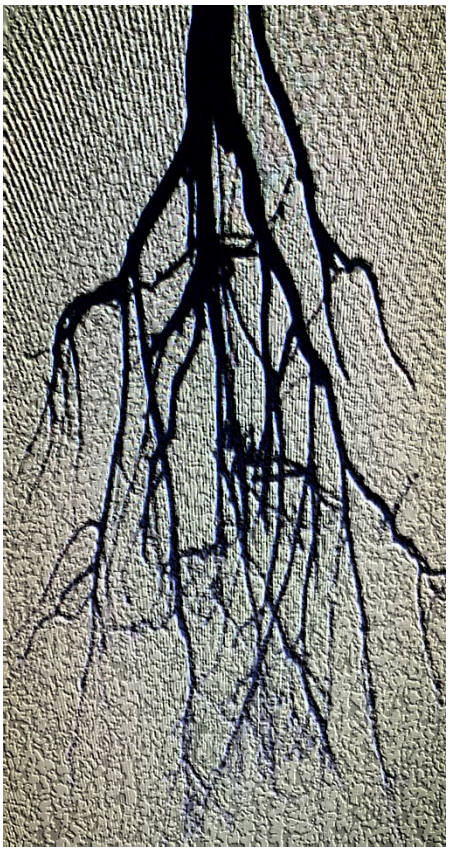

For the Roots
Vol-1, Issue-1, Mother Language

আমার স্বপ্নের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আমার প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয়, আমার জীবনের একটি মূল্যবান অধ্যায়।

বাংলাদেশ সরকার যখন আমাকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন, আমি সানন্দে, অনেক উৎসাহ নিয়ে খুলনার গল্লামারীর পাশে তৎকালীন আর্ট কলেজের কয়েকটি ছোট কক্ষে কয়েকজন তরুণ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করি। ১৯৯১ সালে চারটি ডিসিপ্লিন-এর মাধ্যমে সর্বমোট ৮০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান শুরু হয়। আমি স্বপ্ন দেখতাম এই শিক্ষার্থীরা একদিন দেশে-বিদেশে মাথা উঁচু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষা করবে।

আমার ভাবতে খুব ভাল লাগছে যে, দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে, আর মাত্র তিনটি দশকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী আজ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামকরা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্রে বীরদর্পে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি জাতির ভবিষ্যৎ - একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি সভ্যতার নিদর্শন।

আমি বিশ্বাস করি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা তাদের মুক্ত চিন্তা করতে পারে; বিভিন্ন বিষয়ে দেশ-বিদেশের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে যোগাযোগ করে তাদের জ্ঞান, চিন্তাভাবনা এবং মানসিক বিকাশের পরিধি বাড়িয়ে তুলতে পারে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি সংগঠন, যেখানে শিক্ষক-ছাত্র ও এলুমনাইদের মধ্যে সুহৃদ সম্পর্ক, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট আছে।

আমি বিশ্বাস করি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশে-বিদেশে যেখানেই থাকুক তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকে এবং আমি মনে প্রাণে সেই আশা ব্যক্ত করি, দেশ ও দেশের বাইরে যেখানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলুমনাইরা আছে, তারা যেন দেশের সম্মান সমুন্নত রাখতে পারে।

আজ প্রায় ৩০ বছর পরে যখন আমি আমার অতীতের সেই দিনগুলির কথা মনেকরি, ভাবি টিনের চালের ঘরে যে ছেলেরা তাদের শিক্ষাজীবন শুরু করেছিল আজ তারা এমআইটি, হার্বাট, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে দেশের সুনাম রক্ষা করছে। বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে তাদের এ অক্লান্ত পরিশ্রম আমার স্বপ্নকে প্রতিনিয়ত সফল করে তোলে।

তোমরা সবাই, দেশে-বিদেশে যেখানেই আছো, আজ আমার কাছে আমার অহংকার, আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি, আরও অনেক অনেক সফলতা কামনা করি। তোমরা সুখে থাকো, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের দরবারে বীরদর্পে উন্নত শিরে প্রতিষ্ঠিত করে তোলো।

তোমাদের গুণগ্রাহী,

অধ্যাপক গোলাম রহমান,
প্রথম উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের প্রজন্ম

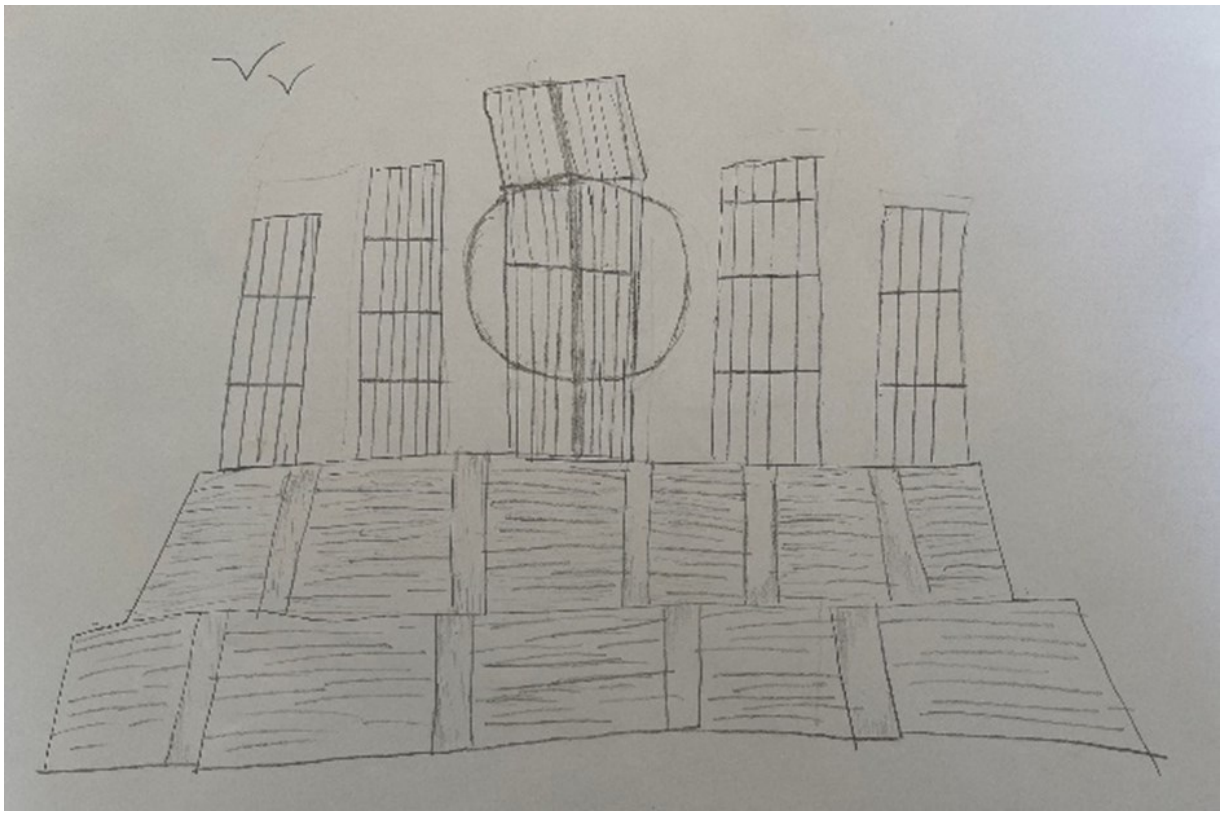

Language

A free man speaks,
He can declare and pronounce.
But a mute man withholds.
He can neither state nor enounce.
For those who aren't blessed,
With the gift of free speech.
For those who can talk,
But never really speak.
Language is a treasure,
That everyone can seek.
Language is a barrier,

Like a wall to break free.
Language is what divides,
Between being you or being me.
For those who aren't blessed,
With the gift of free speech.
For those who can talk,
But never really speak.
Language is a treasure,
That everyone can seek.
Language is a gift,
That can be held with both hands.
Language is a treasure.
To share between the lands.

Nuha Rifat Islam
Parent: Shibli & Rifat (URP, 94)

ভাষা

(অনুবাদ)

মুক্ত মানুষ কথা বলে,
ব্যক্ত করে নিজের দাবি।
বোবা মানুষ থেমে যায়
জানাতে পারে না আকুতি।
বলে কথা আজ সবাই,
যারা বলতো না কোনো দিন -
তারাও সরব উচ্ছ্বসিত প্রতিদিন।

ভাষা অমূল্যধন,
যা সবাই চাইতে পারে।
ভাষা যদি বাধা হয়
সবাই তা ভাঙতে চায়।
তোমার আমার মধ্যে যারা
মুক্তভাষায় সিক্ত -
মাতৃভাষা তাদের কাছে
অপরিসীম অমূল্য।

ভাষা অমূল্য ধন,
যা সবাই চাইতে পারে।
যারা পারে বলতে -
কিন্তু বলেনি কথা কোনোদিন,
তাদের কাছেও মাতৃভাষা-
অমূল্য অমলিন।
ভাষা হলো উপহার-
দুহাত পেতে নিতে হয় ।
ভাষা হলোসম্পদ -
বেঁধে রাখা যায়না সীমানায়।

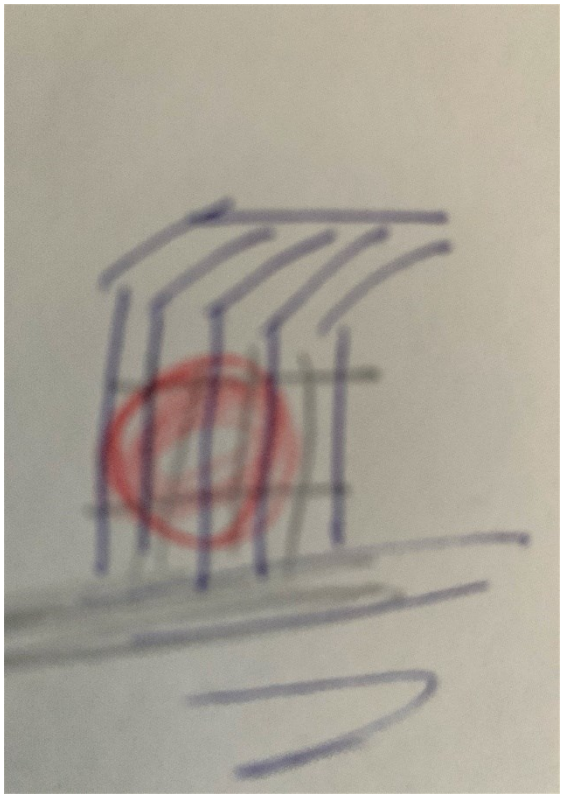

- ***নুহা রিফাত ইসলাম***
পিতামাতা- শিবলী ও রিফাত (নগ্রাপ, ৯৪)

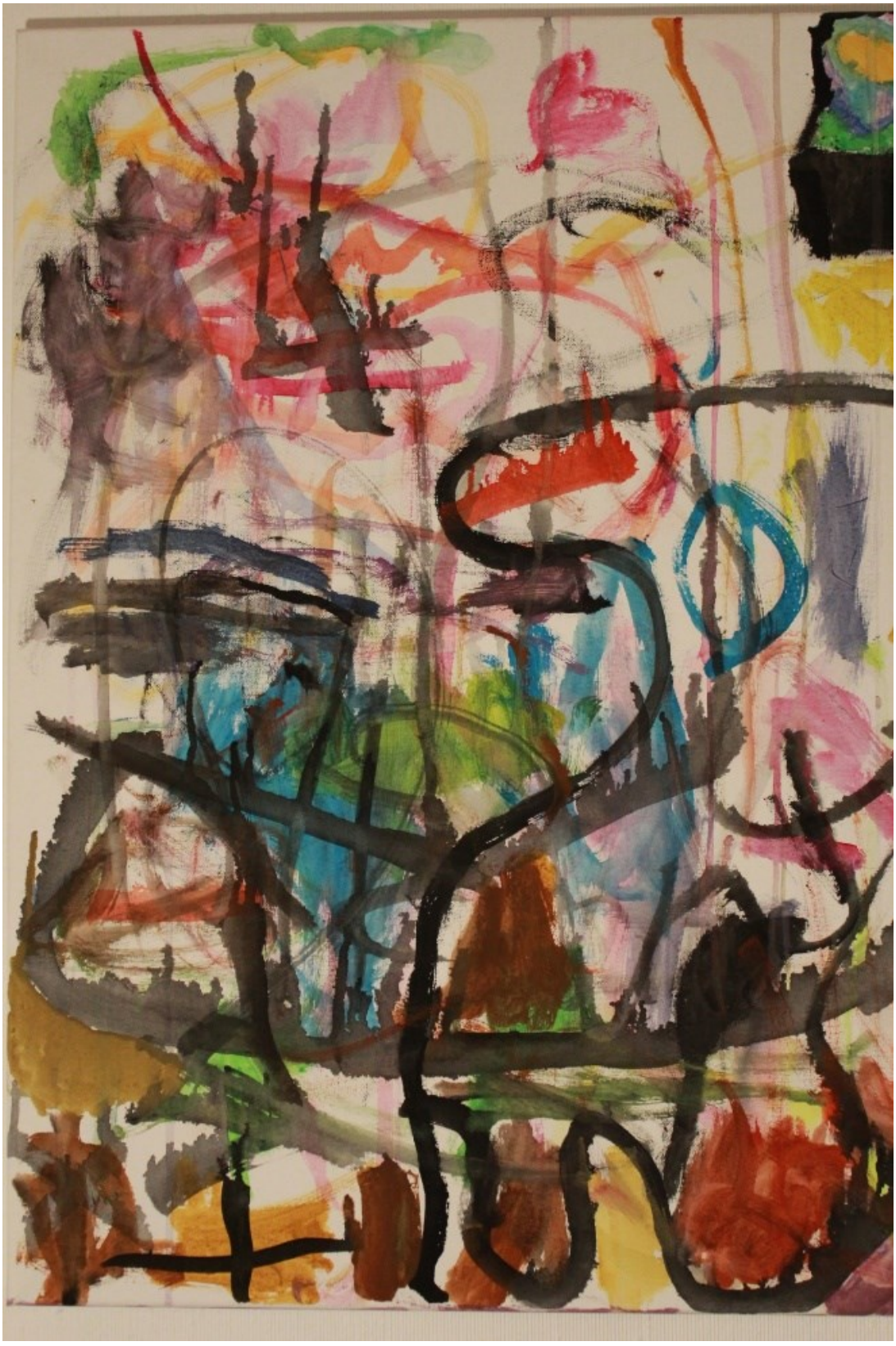

অবনী, পিতামাতা – বাপ্পী (নগ্রাপ, ৯৫) ও শাহিদা আফরোজা (রাণী)

অবনীর তৃতীয় জন্মদিনে, অবনী এবং তার বন্ধুরা এই শিল্পকর্মটি সৃষ্টি করেন।

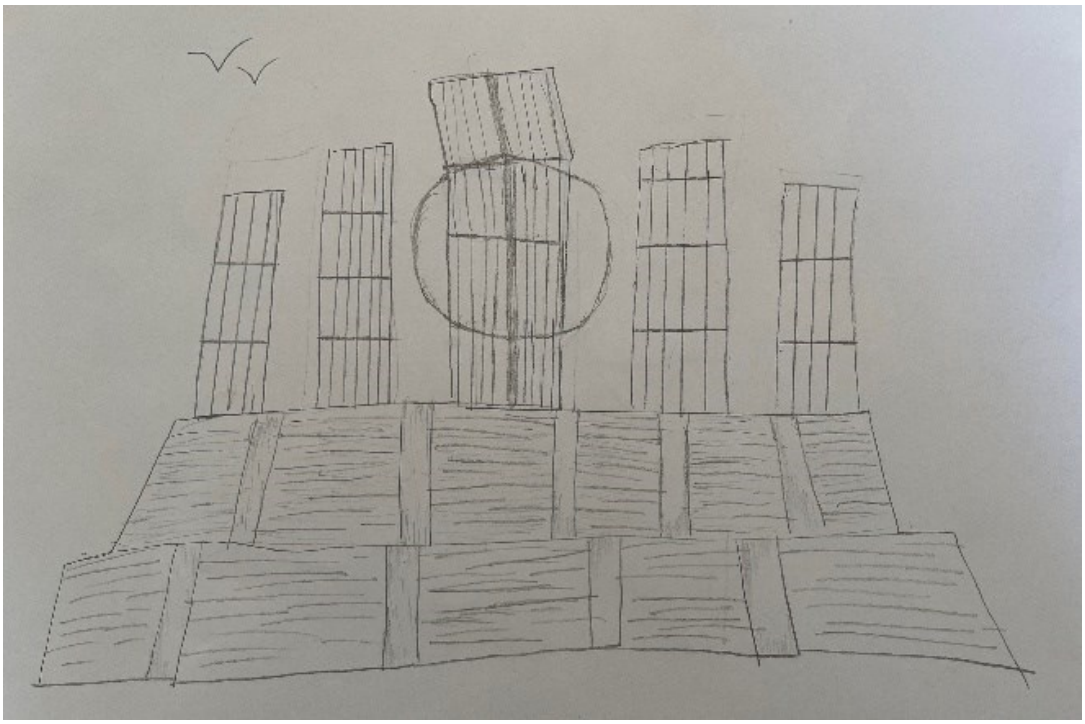

তাহিম
পিতামাতা- টগর (ফউটে, ৯২) ও মেরিনা জাহান

আলভিনা লতিফ মারিশা
পিতামাতা- এলিস ও মুক্তা (নগ্রাপ, ০০)

নুমাহ আমান
পিতামাতা- তৌহিদ ও তিতিয়া, (**স্থাপত্য,৯১**)

নাজিব আমান
পিতামাতা- তৌহিদ ও তিতিয়া (**স্থাপত্য,৯১**)

বাবুই
পিতামাতা: শুভ (নগ্র্যাপ, ৯৪), দীপিকা মল্লিক

সোহা
পিতামাতা: মোর্শেদ (বিবিএ, ৯৪) ও আরজুমান্দ আক্তার

নাবিগ **আমান**
পিতামাতা- তৌহিদ ও তিতিয়া (**স্থাপত্য,৯১**)

ইনায়া
পিতামাতা- টগর (ফউটে, ৯২) ও মেরিনা জাহান

আদিব
পিতামাতা: মোর্শেদ (বিবিএ,৯৪) ও আরজুমান্দ আক্তার

শময়িতা রাইসা ফিরোজ
পিতামাতা: ফিরোজ ও শিমু (নগ্রাপ, ০০)

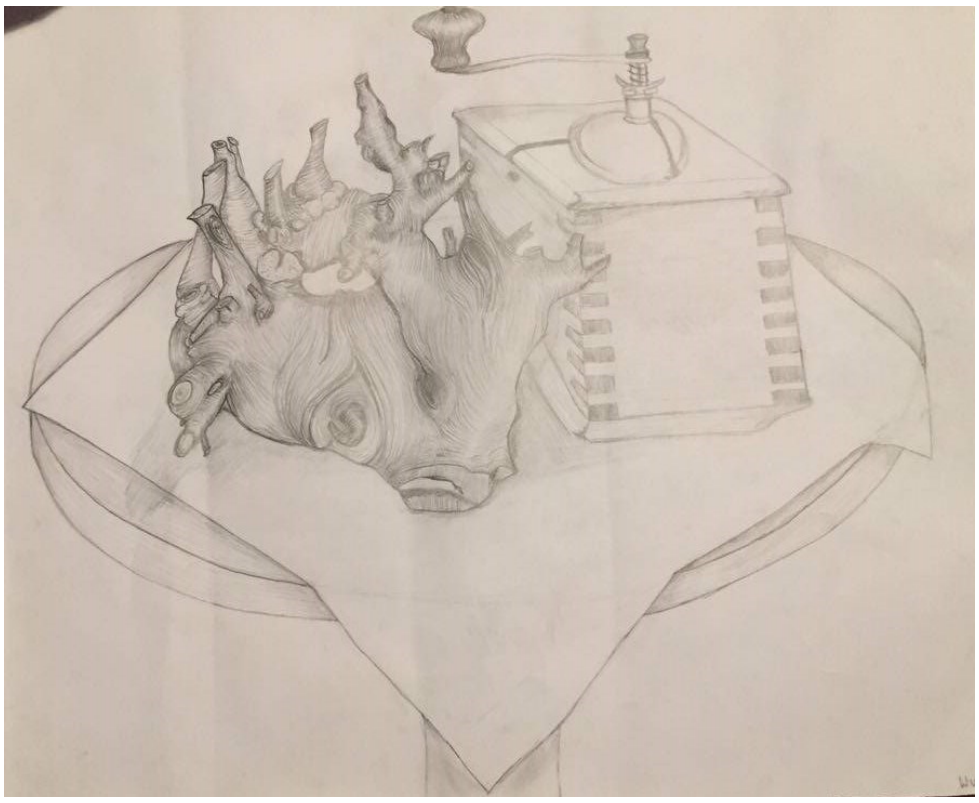

নিতুই
পিতামাতা: শুভ (নগ্র্যাপ, ৯৪), দীপিকা মল্লিক

বিজ্ঞান ও দর্শন

বদলে দাও পৃথিবী

আমরা সবাই হয়তো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটা শুনেছি, তবুও এই লেখায় বিষয়টি সম্পর্কে আমি একটু সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে চাই। আমরা জানি DNA বা ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের জিনোম রহস্য বা জেনেটিক ম্যাপ উন্মোচন করে জীববিজ্ঞানের এই ধ্রুবসত্যটি বিজ্ঞান আবারও প্রমাণ করেছে। Herbert Boyer & Stanely Cohen (1972) প্রথম জেনেটিক মডিফাইড অর্গানিজম এর ধারণা দেন, যার ভিত্তিতে মাছ, মাংস, সবজি এবং ফসল উৎপাদন কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যেটা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ। এ প্রযুক্তির আর একটি যুগান্তকারী প্রায়োগিক দিক হল বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের সফল সমাধান, যা বিশ্বকে একটি সুন্দর ভবিষ্যত উপহার দেবার আভাস দিচ্ছে। এই প্রযুক্তির মূলকথা হলো, যে কোন জীবের জিন (বা কতগুলো ডিএনএ সিকোয়েন্স) এর মধ্যে যদি কোন প্রকার ক্ষতিকর অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তবে সেই অংশটুকু কেটে অন্য একটি সুস্থ ডিএনএ অংশ সেখানে এনে জোড়া দেয়া, যাতে সেই ক্ষতিকর জিনটি জীবের কোন ক্ষতি করতে না পারে। শুনতে সহজ মনে হলেও কাজটি অনেক জটিল ও ব্যয়বহুল। কারণ এটি ছুরি বা কাঁচি দিয়ে কাটাছেড়া বা জোড়াতালি দেওয়া নয়, বরং এই কাজটি উন্নত মানসম্পন্ন গবেষণাগারে সম্পন্ন হয়ে থাকে ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত বিভিন্ন প্রকার রেস্ট্রিকশন এনজাইম এর সাহায্যে।

মানুষের কল্পলোকের চিন্তাসমূহ যেমন - আমি যদি নিউটনের মত মেধাবী হতাম, রোগমুক্ত জীবন পেতাম অথবা দুর্ঘটনায় হারানো কোন অঙ্গ ফিরে পেতাম, অথবা আমরা যদি এভারগ্রীন থাকতে পারতাম, (ইত্যাদি) বাস্তবে রুপ দেওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে এই প্রযুক্তি। পূর্বে এই প্রযুক্তির ব্যবহারে নানান রকম জটিলতাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল থাকলেও ২০১২ সালে "CRISPR/CAS9" প্রযুক্তি আবিষ্কার হওয়ার পর আমাদের উপরোক্ত কল্পলোকের ভাবনাগুলো আর ভ্রান্তিবিলাস মনে করে দুঃখ পাবার কারণ নেই, আপনি চাইলে এর যে কোনোটি খুব সহজেই সম্পন্ন করতে পারেন।

"CRISPR/CAS9" জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সর্বশেষ প্রায়োগিক প্রযুক্তি। ২০১২ সালে বিজ্ঞান সাময়িকী সাইন্সে-এ আমেরিকান বিজ্ঞানী Prof. Jennifer A. Doudana আর সুইডিশ বিজ্ঞানী Prof. Emmanuelle Charpentier যৌথভাবে এই গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যা একবিংশ শতাব্দীর সেরা আবিষ্কার বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং এর স্বীকৃতি স্বরূপ তারা দুজনেই যৌথভাবে ২০২০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন।

এই প্রযুক্তির মূলকথা হলো, আপনি যদি আপনার শরীরের কোন ক্ষতিকর জিনকে নিষ্ক্রিয় অথবা শরীর থেকে বাদ করে দিতে চান, তাহলে সেই জিনের অন্তর্গত কোন একটা ডিএনএ এর বিশেষ অংশ (যাকে প্রদর্শক আরএনএ বলা হয়), synthetically তৈরি করে তার সাথে বিশেষ প্রক্রিয়ায় CAS9 Enzyme যুক্ত করে সেলের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। এই প্রবেশ করানো ডিএনএ সিকোয়েন্স প্রাণীর দেহে জিপিএস সিস্টেম এর মত কাজ করে সেই কাঙ্খিত ক্ষতিকর জিন সিকোয়েন্স এর সাথে মিলিয়ে দেয়, তখন CAS9 enzyme কাঁচির মতো ওই ক্ষতিকর ডিএনএ অংশ কেটে দেয়, ফলে সেই জিন তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং

আপনি সেই ক্ষতিকর জিনের প্রভাব থেকে মুক্তি পাবেন।

Genetic Engineering (CRISPR/CAS9) - এর সফল প্রয়োগঃ

জীবদেহে অবস্থিত ডিএনএর মধ্যে একটি মাত্র নিউক্লিওটাইড এর হেরফের বা মিউটেশন হলেই দেহে Cancer সহ নানা ধরনের জেনেটিক রোগ তৈরি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান ইতিমধ্যে তিন হাজারেরও বেশি ধরনের জেনেটিক রোগ শনাক্ত করেছে। এ ধরনের জেনেটিক অসামঞ্জস্যতা নিয়ে জন্মানো শিশুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত থাকায় ইউরোপে ১৯% গর্ভপাত করানো হয়, যার অধিকাংশই এখন এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স একটা বড় আকারের সমস্যা, যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তির ব্যবহার করে সফল হচ্ছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে "Aging Therapy" দিয়ে মানুষকেকে চিরসবুজ রাখাও সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই প্রযুক্তির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এবং উল্লেখযোগ্য দিক হলো, ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি প্রতিরোধে Gene Therapy ও বিভিন্ন ধরনের ঔষধ এর উদ্ভাবন। স্টকহোমে অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম সেরা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি Karolinska Institute এর ডিপার্টমেন্ট অফ সেল এন্ড মলিকুলার বায়োলজি - এর গবেষনাগারে আমরা একদল গবেষক Breast Cancer নিরাময়ের জন্য এই প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছি। অচিরেই আমরা পরীক্ষামূলকভাবে মানুষ ও পশুপাখির উপর প্রয়োগ শুরু করবো, পরিপূর্ণভাবে সফল হলে, এটা সারা বিশ্বের Breast Cancer এ আক্রান্ত রোগীদের জন্য নতুন আশার সৃষ্টি করবে।

- গাজী, বিজিই-৯৭

.

দুর্নীতির কলঙ্ক ঘুচিবে কবে?

দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে অবিরাম গতিতে, চারিদিকে বইছে শুধু উন্নয়নের জোয়ার। প্রমত্ত পদ্মার বুকে তৈরি হয়েছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর সেতু, কর্ণফুলীর নিচ দিয়ে তৈরী হচ্ছে সুবৃহৎ সুড়ঙ্গ। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আজ প্রতিবেশী দেশগুলোসহ সমগ্র বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। আশাকরা হচ্ছে যে, আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেশের এ ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের সংবাদগুলো পড়তে যেমন ভালো লাগে, তেমনি ভালো লাগে এ সংবাদগুলো ভিনদেশি বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করতে। তবে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত দুইটা সংবাদ প্রতিনিয়ত আমাদের ভালো লাগাগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অর্থাৎ (১) যখন পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত দেশ/শহরগুলোর তালিকা প্রকাশ করা হয়, এবং (২) যখন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের তালিকা প্রকাশ করা হয়। কারণ এ দুই তালিকাতেই আমরা বেশ আগে থেকেই চ্যাম্পিয়ন বা প্রথম সারিতে।

দূষণ এবং দুর্নীতি একে অপরের পরিপূরক। গবেষণায় দেখা গেছে যে, দূষিত এলাকায় বসবাসকারীদের অপরাধ করার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে এবং সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতি বেশি থাকলে মানুষ নিজের উন্নয়নে বেশি মনোনিবেশ করে । ফলে পরিবেশ উন্নয়নের বিষয়টি কম গুরুত্ব পায়। সম্প্রতি প্রকাশিত "ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল" এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালেও আমরা দুর্নীতিতে সেরাদের কাতারেই ছিলাম। এ সংবাদ দেশে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের জন্য কেমন ছিল সেটা আমরা উপলব্ধি করতে না পারলেও, এটা যে সকল প্রবাসীদের জন্য খুবই দুঃখ ও লজ্জাজনক ছিল সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দুর্নীতিতে আমাদের বর্তমান অবস্থা যে সহজে পরিবর্তন হবার নয় সেটা পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের অপরাধচিত্রই বলে দেয়। সমাজের সকল স্তরে আজ অসৎ, মিথ্যাবাদী এবং ঠকবাজে ভরে গেছে, দুর্নীতি দমন কমিশন নিজেও জড়িয়েছে দুর্নীতিতে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং রাজনীতিবিদরাতো আবার দুর্নীতিকে অনেকটা সাংবিধানিকভাবে বৈধতা দিয়েছেন এভাবে যে - জনসাধারণ তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করতে পারবেনা। কোনোভাবে অভিযোগ গঠন হলেও সুষ্ঠু বিচারের আশা না করাই ভালো, কারণ অভিযোগ তদন্তকারী সংস্থাগুলো ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিবেদন দেয় এবং কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে চাকরিচ্যুত ও উপযুক্ত শাস্তির বদলে সাময়িক অব্যাহতি, পদাবনতি বা স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া সরকার সংশ্লিষ্টদের অন্যায়কে হালকা বা গায়েব করার জন্য হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্টতো আছেই।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট নিয়ে একজন মন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি এটাকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করেননা, কারণ রিপোর্টে পাকিস্তানকে আমাদের চেয়েও কমদুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে মাননীয় মন্ত্রীর এ মন্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হবে। তবে, কোনো পাকিস্তানির সাথে কথা বললে হয়তো এ রিপোর্টের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

উদাহরণস্বরূপ: গত ডিসেম্বরে পাকিস্তান সরকারের একজন উচ্চপর্যায়ের আমলার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল স্টকহোম শহরে। আলোচনাক্রমে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্নরকম উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ সফলতার কারণ (আমার দৃষ্টিতে) জানতে চান। আমি তাকে বলেছিলাম যে - ব্যক্তি পর্যায়ে উন্নয়নের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে - আমরা এখন অনেক পরিশ্রমী, সবাই নিজের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য খুবই সচেষ্ট, সামাজিকভাবে কেউই বেকারত্ব পছন্দ করেনা। এছাড়া কৃষিতে বিপ্লব ঘটছে, এক কোটিরও বেশি মানুষ ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন, দেশের ভিতর ছোট-বড় অনেক উদ্যোক্তা প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ করছে। আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সফলতা বলতে গেলে ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের দূরদর্শিতাই মূল কারণ।

প্রত্যুত্তরে আমিও তাকে পাকিস্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি যেটা বলেছিলেন সেটা খুবই অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্জনক। আমরা যেমন সবাই কর্মমুখী, পাকিস্তানে নাকি এর ঠিক উল্টো! পরিবারের একজন কাজ করলে অন্য সবাই তার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চায়। নিজ উদ্যোগে নতুন কিছু করা বা ছোট-খাটো কোনো কাজ করা তাদের সামাজিক প্রথায় নেই বললেই চলে, এবং মূলতঃ এ কারণেই পাকিস্তান কোনোভাবেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সফল হচ্ছে না। প্রসঙ্গক্রমে, দুর্নীতির কথা উঠলে তিনি সেটা অকপটে স্বীকার করেন। তবে একটা কথা তিনি খুব জোর দিয়া বলেন যে - সরকারের উচ্চপর্যায়ের লোকেরাই মূলতঃ দুর্নীতির সাথে জড়িত, স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-নেত্রী বা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তুলনামূলক ভাবে সৎ। তার এ কথাটি দুর্নীতির তালিকাতে বাংলাদেশের তুলনায় পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থানকে সমর্থন করে বলে আমার বিশ্বাস (যদিও তাদের অবস্থান আমাদের কাতারেই)।

অন্যদিকে আমাদের দেশের উচ্চপর্যায়ের নেতা-নেত্রী, কর্মকর্তাদের যেমন বহির্বিশ্বে বেগমপাড়া আছে, তেমনি সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের লোকজনদের আছে একাধিক বাড়ি-গাড়ী, অঢেল অর্থ-সম্পদ। আজ দুর্নীতির বিষয়ে নেতারা দোষারোপ করেন সরকারি কর্মকর্তাদের, আর আমরা জনসাধারণ দোষারোপ করি নেতা-নেত্রীদের। তবে সুক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে নেতা-নেত্রীদের অভিযোগ সত্য বলে মনে হবে, কারণ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া কারো পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। এবং খুবই পরিতাপের বিষয় এইযে, এরা সবাই, বিশেষ করে কর্মকর্তাগণ উচ্চশিক্ষিত। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী আমাদের লজ্জার মূল কারণ আমাদের মতো তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিতরাই, আর তাই এই দায়ভার আমাদের পরিবারের এবং আমাদের সকলের। পরিশেষে, দুর্নীতিবাজ যেই হোক না কেন এদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন কেবল অবকাঠামোর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিশ্ববাসীর কাছে দুর্নীতিগ্রস্থ জাতি হিসাবে আমাদের অপমানিত হতে হবে। তাই আসুন, আজ মহান মাতৃভাষা দিবসে সকল ভাষাশহীদ, সকল মুক্তিযোদ্ধা, সকল দেশপ্রেমী মানুষসহ মাতৃভূমির সর্বময় কল্যাণ কামনা করে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে এই দোয়া করি এবং একই সাথে প্রতিজ্ঞাকরি যে - আমরা যে যার অবস্থানে, যেকোনো পরিস্থিতিতে, সর্বদা সৎ ও নিষ্ঠাবান থাকার চেষ্টা করবো এবং আমাদের আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে একটি সুখী সুন্দর-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ ও শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত করবো।

- পারভেজ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ০২

কানু মামার সাথে ঘোরাঘুরি

কানু মামার বোনের ছেলে রকি। এখনো প্রাথমিক স্কুলের গন্ডি পার করেনি। কিন্তু এই বয়সেই তার জানার আগ্রহের কোনো শেষ নেই। কোনো বিষয়ে তার কৌতূহলের কোনো কমতি নেই। এটার মানে কী? ওটার মানে কী? এটা কেন বলে? এটা কিভাবে হয়? এসব প্রশ্ন করতে করতে সে তার বাবা-মার মাথা গরম করে ফেলে। যদিও সে ইউটিউব থেকে অনেক কিছু নিজে খুঁজে বের করে দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু ইউটিউবে বিষয়বস্তুগুলো ইংরেজি ভাষায় থাকার কারণে এবং সেগুলো খুঁজে বের করতে জটিলতা হওয়ার কারণে সে প্রায়শ হতাশ হয়ে পড়ে।

তাই কানুমামা ঠিক করলেন, তিনি সপ্তাহে অন্তত একদিন তার ভাগ্নের সাথে ঘুরে বেড়াবেন। আর তার ভাগ্নের কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজের জানা গন্ডির এর মধ্যে থেকে খুব সহজভাবে দেবার চেষ্টা করবেন। আর প্রয়োজন হলে এজন্য তিনি একটু পড়াশোনা করবেন অথবা তিনি ইউটিউব ভিডিও দেখে বোঝার চেষ্টা করবেন। আর একান্ত প্রয়োজন হলে তিনি আর বন্ধুদের সাথে আলোচনা করবেন। আর সেটা অবশ্যই সেই বন্ধুদের সাথে যিনি সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

আজকে কানুমামা তার ভাগ্নেকে নিয়ে প্রথম দিনের মতো বেড়াতে বের হবেন। রকির বাবা তাকে কানু মামার বাসায় পৌঁছে দিবেন এবং সেখান থেকে মামা ভাগ্নে দুজন মিলে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করবেন। কানুমামা বেশ কিছুক্ষণ আগেই প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। এর মধ্যেই কলিং বেল শোনা গেল এবং কানুমামা দরজা খুলে দেখলেন রকি দাঁড়িয়ে আছে। তার বাবা তাকে নামিয়ে দিয়ে ইতিমধ্যেই চলে গেছেন।
দরজা খুলতেই রকি বললো মামা আমি এসে গেছি, চলো আমরা এখন ঘুরতে বের হই। কানুমামা আর ঘরের ভিতর প্রবেশ না করে রকিকে নিয়ে বের হলে। রাস্তায় পা ফেলতেই রকি প্রথম প্রশ্ন করে ফেলল।

রকি - মামা এনার্জি কী?
কানু মামা - আগে বলো এনার্জির বাংলা কী?
রকি - এনার্জির বাংলা শক্তি।
কানু মামা - তারমানে তুমি জানতে চাও শক্তি জিনিসটা কী?
রকি - জি মামা।
কালু মামা – তাহলে প্রথমে আমাকে বলো, তুমি যে মাঝেমধ্যেই বল আমার কোন শক্তি নাই, সেটা বলতে তুমি কী বুঝাও?
রকি - সেটা বলতে আমি বুঝাই যে, ঐ কাজটা করার জন্য আমার হাত-পা উঠানোর শক্তি নাই, আমি অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি, তাই কাজটি করা আমার পক্ষে তখন সম্ভব না।
কানু মামা – তার মানে তুমি বুঝাতে চাও, তোমার হাত-পা উঠানোর জন্য তোমার শরীরে শক্তি দরকার। তাহলে এই শক্তি তোমার শরীর কোথা থেকে পায়?
রকি - আমরা যে খাবার খাই সেগুলো থেকে আমাদের শরীর এই শক্তি পায়।
কানু মামা - তার মানে এটা দাঁড়ালো যে, আমরা যে খাবারগুলো খাই, সেখান থেকে আমাদের শরীর শক্তি বা এনার্জি পায়। আমাদের শরীর সেই খাবারগুলোকে বিশেষ উপায়ে শক্তিতে রূপান্তর করে আর আমরা সেই শক্তি দিয়ে চলাফেরা ও কাজকর্ম করি। তার মানে তুমি এখন এটা পরিস্কার বুঝতে পারলে যে, আমাদের চারপাশে যেসব যন্ত্র কাজ করে বা চলাফেরা করে, তাদের প্রত্যেকের কাজ করার জন্য শক্তি বা এনার্জির প্রয়োজন হয়।
রকি - জী মামা, বুঝতে পেরেছি।
কানু মামা - যেমন ধরো, মোটর সাইকেলকে চলার জন্য শক্তি বা এনার্জির দরকার। আবার একইভাবে চুলায় রান্না করার জন্য আমাদের শক্তি বা এনার্জি দরকার বা টিভি দেখার জন্য আমাদের শক্তি বা এনার্জি দরকার।

রকি - তাহলে তো মামা আমাদের চারপাশে যে গাছগুলো বড় হচ্ছে, সেগুলো বড় হওয়ার জন্য শক্তি বা এনার্জি দরকার।

কানু মামা - একদম সঠিক। আমাদের বড় হওয়ার জন্য যেমন খাদ্য ও পানির দরকার, ঠিক একইভাবে গাছপালার বড় হওয়ার জন্যও খাদ্য ও পানি দরকার এবং সেইসাথে সূর্যের আলোও দরকার। তাই এই পৃথিবীর শক্তির প্রাথমিক উৎস হল সূর্য। সূর্যের আলো পৃথিবীতে না আসলে আমরা আর কোন ধরনের শক্তির উৎসই পৃথিবীতে পেতাম না। সূর্যের এই শক্তি

বিভিন্নভাবে অন্যান্য শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

রকি - রূপান্তরিত হয়ে থাকে মানে কী?

কানু মামা - রূপান্তরিত হওয়া মানে এক রকম থেকে অন্য রকম শক্তি পাওয়া। এটা বোঝার আগে তোমাকে জানতে হবে শক্তি কত প্রকার ও কী কী? শক্তি বিভিন্ন প্রকার হয়, যেমন আলোক শক্তি - যেটা তুমি চোখে দেখতে পাও, যান্ত্রিক শক্তি - যে শক্তিতে মোটর সাইকেলের চাকা রাস্তায় ঘুরে বা কলকারখানায় মেশিনগুলো ঘুরতে থাকে, রাসায়নিক শক্তি - এটা তুমি মোটর সাইকেলের মধ্যে পেট্রোল দিলে মোটর সাইকেলকে চলতে দেখো অর্থাৎ পেট্রোল এর মধ্যে রাসায়নিক শক্তি থাকে, সৌরশক্তি - যেটা সূর্য থেকে সরাসরি আলোর মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে, বিদ্যুৎ বা তড়িৎ শক্তি - যে শক্তিকে আমরা তারের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে পরিবাহিত করি। এছাড়া আরো কিছু শক্তি রূপান্তর আছে যেগুলো তুমি বড় হতে হতে জানতে পারবে। এক্ষেত্রে তোমার একটা ছোট্ট জিনিস জেনে রাখা দরকার যে, মানুষ কোন শক্তিকে নতুনভাবে সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না, শুধু শক্তিকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন করতে পারে, যেমন তুমি রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারো, আবার যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করতে পারো বা তড়িৎ শক্তিকে ভিন্ন প্রকার শক্তিতে রূপান্তর করতে পারো। তবে সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মোট শক্তির পরিমাণ দুই দিকেই সমান থাকবে। এটা তোমার বোঝার জন্য একটু কঠিন হয়ে গেলেও তুমি বড় হলে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে।
এর পর...

- সজীব, নগ্রাপ ৯৯

সর্বোচ্চ শিখরে নয় সফলতা -

সফলতা হোক জীবনের আত্মতৃপ্তিতে

একজন নারী শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক হিসাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের অংশীদারিত্ব স্বীকার করছি এবং সেই সাথে মাতৃত্ব ও পেশাগত জীবনকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে চলমান আছি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে ছোট-বড় সবাই মিলে একটি পরিবারের মত চলা যায়, কিভাবে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনকে সম্মান করতে হয়। প্রথাগত রাজনীতি মুক্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুত্বের এক অকৃত্রিম পাঠাগার, যা বাংলাদেশের অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ব্যতিক্রম।
আমার জীবনের অধিকাংশ অধ্যায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক। শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক এবং কিছু কিছু সময় শ্রেণিকক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে নারী শিক্ষার্থীদের আবাসিক হলের সহকারী এবং প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। অনেক বেশি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্টতার সুযোগ পেয়েছি এবং নিজেকে সম্মানিত অনুভব করেছি তাদের সংস্পর্শে থাকতে পেরে।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, এবং গেহন্ট ইউনিভার্সিটির প্রাঙ্গণ আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করছে। বর্তমানে আমি ইউরোপের স্বনামধন্য Gent ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছি। করোনাকালীন পৃথিবীর এই দুঃসময়ে, আমার চার বছর বয়সী পুত্র সন্তানই আমার ব্যস্ত জীবনের একমাত্র সঙ্গী।
দীর্ঘ সাত বছর পর আবার আমি উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার কাজ শুরু করেছি বিগত ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে। বেলজিয়াম-এ যাত্রা শুরুর বাস্তবতা ছিল ভীষণ বন্ধুর। প্রথম প্রতিবন্ধকতা ছিল আমার নিজের সাথে। অনেককাল গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপনের কারণে নিজের আত্মার খোরাক কি সেটি ভুলতে বসেছিলাম। আমার চারপাশ ঘিরে যা কিছু সফলতা বলে অনেকের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছিল, তা আমার কাছে বোঝার মত লাগছিল। আমি হারিয়ে ফেলছিলাম আমার সবচেয়ে ভালোবাসার

এবং আত্মতৃপ্তির উপকরণ 'গবেষণা'। অনেকে বলছিল বিদেশে পড়তে যাওয়ার কি দরকার? দেশে থেকেই তো প্রচুর গবেষণা করা যায়। আমি ভেবেছি অবশ্যই যায়, তবে তার জন্য আমাকে যোগ্যতর হতে হবে, আরো জানতে হবে, শিখতে হবে । আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নেই – তার জন্য পিএইচডি করা সবচাইতে উত্তম। জ্ঞান অর্জনে ইউরোপ আমার কাছে আরাধ্য ছিল। বয়স, বাচ্চা, অনাভ্যস্থতা এবং জড়তা, কোন কিছু আমাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ভীষণ সাহসী মনোবল নিয়ে, স্থির চিত্তে, চুপচাপ প্রচেষ্টা করে গেছি। আই,ই,এল,টি,এস, এবং পিএইচডি অ্যাডমিশন ও বৃত্তির পাবার জন্য, একসময় সফল হয়েছি।

আত্মীয়, পরিবার এবং বন্ধুরা সবাই আমাকে মানসিকভাবে সহযোগিতা করেছে । আমার অর্ধাঙ্গ - সেও বলেছে তুমি কখনোই বাংলাদেশে পিএইচডি করবে না, কারণ তিনি একজন খুবিয়ান। আর একজন খুবিয়ান জানে, দেশের প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের, অধিকাংশই স্বপ্ন দেখে বিশ্বমানের শিক্ষা অর্জনের এবং সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকেই।

পরিশেষে এইটুকুই বলতে চাই, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যোগ্যতরভাবে ভিত্তি গড়ে দিয়েছে গবেষণা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য। বাংলাদেশের জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিয়েছে। সুযোগটাকে সম্মান করুন এবং নিজেকে গড়ে তুলুন দেশ ও দশের জন্য। দেশ-বিদেশে আপনার সাফল্য এবং অর্জন হোক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের গর্ব!

- নাজিয়া হাসান, ই এস ০২

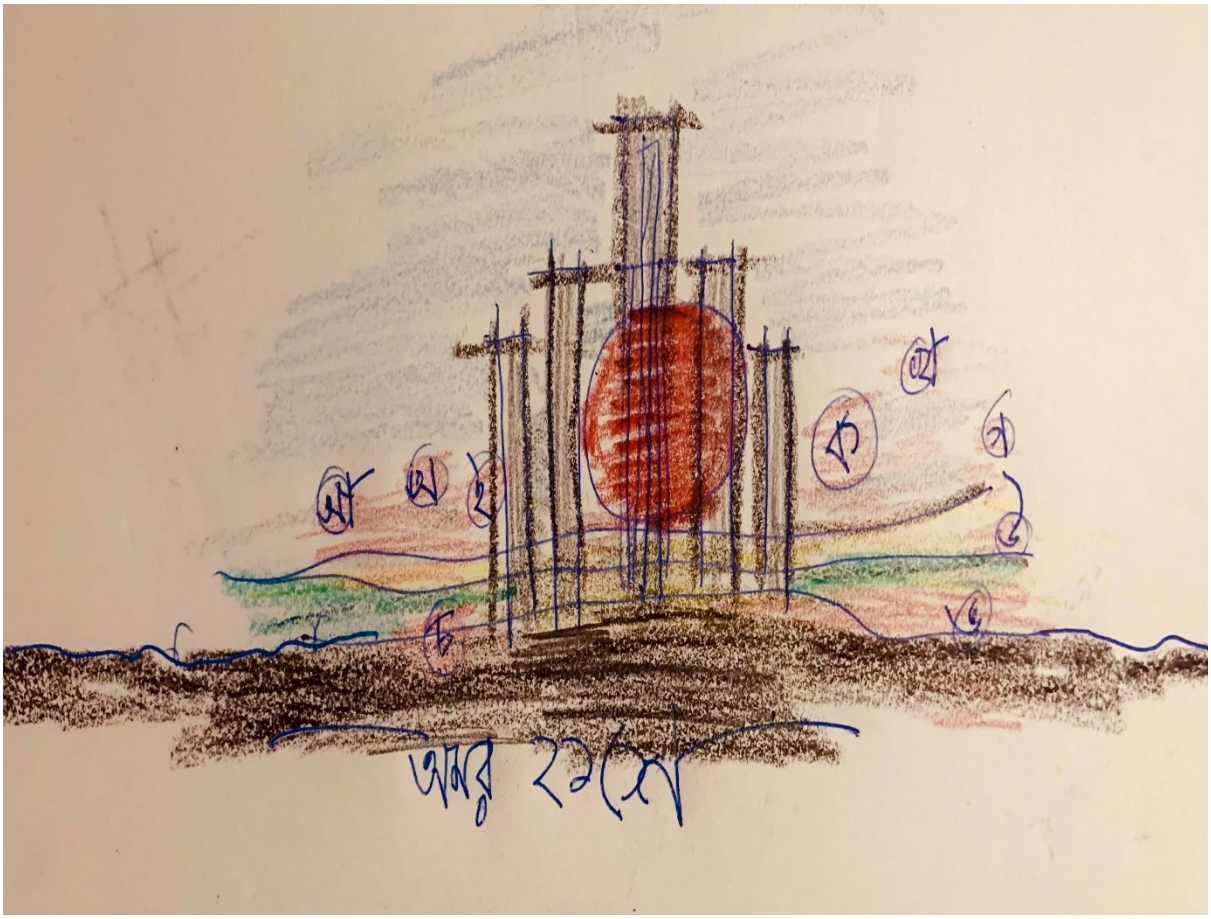

ভাষা শহীদের প্রতি ইউরোপে বসবাসরত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

সমাজ ও অর্থনীতি

সোহেল মামা

তারিখটা আমার ঠিক মনে নেই, সম্ভবত তেশরা নভেম্বর ২০০৫। ভোরবেলা আমি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে পৌঁছাই। এটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম এরোপ্লেনে উঠা। কি এক অজ্ঞাত কারণে আমার ভর্তির কাগজ দেরিতে পৌঁছায়, ফলশ্রুতিতে আমার জার্মান এমব্যাসি থেকে ভিসা পেতে দেরি হয়, যদিও আমার ইউনিভার্সিটি ক্লাস অক্টোবরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার ইউনিভার্সিটি মিউনিখে ছিল তবুও আমাকে আসতে হয় ফ্রাংকফুর্টে, কারণ আমার কোন পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব বা চেনা জানা কেউ ছিলনা মিউনিখে। জার্মানিতে চেনা বলতে ছিল আমার এক খালাতো বোন, যিনি তার পরিবার নিয়ে থাকেন ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছাকাছি, প্রথম এক সপ্তা আমি তার ওখানেই ছিলাম। নতুন দেশ, নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, সবকিছুই নতুন। এরইমধ্যে আমার বোন তার এক দুরসম্পর্কের আত্মীয়ের সন্ধান পেলেন মিউনিখে।

অনেক বছর যাবত ভদ্রলোক ওখানেই থাকেন তার পরিবার নিয়ে। ফোনে আমার সাথে কথা বলতে খুবই অমায়িক মানুষ মনে হচ্ছিল তাকে। তারপর কেমন যেন একটা অচেনা অজানা ভয় কাজ করছিল সব সময়, নতুন জায়গা - কাউকে চিনি না, কোথায় থাকবো কিছু জানিনা, তাদের ভাষা বুঝিনা, সব কিছু নিয়েই প্রচন্ড চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। যাইহোক, দীর্ঘ সাড়ে চার ঘন্টা ট্রেনে চেপে আমি মিউনিখে পৌঁছানোর আগেই ভদ্রলোক রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কারণ উনি জানতেন আমার কাছে কোন মোবাইল ফোন নেই। প্রথম দেখাতেই অজানা কোনো এক কারণে ভদ্রলোককে ভালো লেগে গেল। হ্যাঁ, উনি আমার সোহেল মামা। ঐদিন থেকে আজ অব্দি মামা আমার জন্য যা যা করেছেন, যা তিনি নিজের ছেলের জন্য করেন কিনা জানিনা।

মিউনিখে আসার পরে আমার কোন ডরমেটরি ছিল না, বাধ্য হয়ে প্রথম কিছুদিন তার বাসাতেই ছিলাম। মামী ছিলেন আরও ভালো, প্রচন্ড প্রাণবন্ত একজন মহিলা। আর ছয় মাসের বাঁধন (মামাতো বোন) তো ছিল দিব্বি একটা পুতুল। একটিবারের জন্য মনে হয় না, নিজের পরিবারের বাইরে কোথাও আছি। কাজের থেকে ছুটি নিয়ে মামা আমাকে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে গেলেন, নিজে ওদের জিজ্ঞাসা করলেন ভর্তি প্রক্রিয়া, ডরমিটরি কিভাবে পাওয়া যায়, হেলথ ইন্সুরেন্স কিভাবে করতে হয়, সব জেনে একে একে প্রত্যেকটা কাজ আমার সাথে থেকে করে দিলেন। মিউনিখে বাসা পাওয়া সবসময়ই কষ্টকর কাজ, মামা তারও ব্যবস্থা করে ফেললেন। ডরমিটরিতে এক বাঙালি ভাই ডবল রুমে থাকতেন। তার ওখানে একটা বেড ফাঁকা ছিল। আমি সেখানে উঠে গেলাম।

ডরমিটরি তে খাওয়া-দাওয়ার প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছিল। যেহেতু আমার রান্নার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিলনা এবং আমার রুমমেট সকাল বেলা কাজে বেরিয়ে যেত আর সেই রাতে ফিরত রুমে, রান্নার কোন সময় তিনি পেতেন না। বেশিরভাগ সময় তিনি তার কাজের জায়গা থেকে খেয়ে আসতেন। তখনও পর্যন্ত আমার রেসিডেন্স পারমেন্ট নেওয়া হয়নি, তাই

মোবাইল ফোন নেয়া সম্ভব ছিল না। আমি কেমন আছি কি খাচ্ছি সেটা জানার জন্য মামা তার কাজ শেষ করে যাওয়ার সময় প্রতিদিনই আসতেন। আর আসার সময় সাথে করে তাব রেস্টুরেন্টের খাবার নিয়ে আসতেন।

এভাবে মাস খানেক চলে গেল, হাতের যে টাকা ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছিল, কোনো কাজ শুরু করতে পারছিলাম না রেসিডেন্স পারমিট না থাকার

কারণে। অন্যদিকে রেসিডেন্স পারমিট নিতে পারছিলাম না কারণ ব্যাংকে যে পরিমাণ টাকা থাকা দরকার, অর্থাৎ ৭৬০০ ইউরো ছিল না আমার কাছে। হাতের পাঁচ আমার সব মিলে ছিল সাড়ে পাঁচশ ইউরো মত, তা থেকে এক মাসের বাসা ভাড়া দেওয়ার পরে হাতে ছিল চারশত ইউরো। কিভাবে কি করব কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না, ব্যাপারটা আমার রুমমেটের সাথে শেয়ার করি। দুইদিন পরে যথারীতি কাজ শেষ করে যাওয়ার সময় মামা আসেন - আমাকে বলেন পাসপোর্ট যে টাকা আছে তা সাথে নিয়ে তার সাথে যাওয়ার জন্য। ওই রাতে তার বাসায় থাকি, এবং পরেরদিন সকাল বেলা নাস্তার টেবিল-এ উনি বললেন, নাস্তা খেয়ে ওনার সাথে বাইরে যাওয়ার জন্য।

প্রথমে উনি আমাকে ব্যাংক-এ নিয়ে গেলেন এবং একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেন, বলেন - আমার কাছে যা আছে তা উনাকে দেওয়ার জন্য। তারপর যা হয়, সেটার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না, দেখি মামা উনার ব্যাংক থেকে অনেকগুলো টাকা বের করে আমার টাকার সাথে এক করে সব মোট ৮০০০ ইউরো আমার একাউন্টে জমা দেন। এবং বললেন কাল কে একটা অ্যাকাউন্টের প্রিন্ট আউট নিয়ে সিটি কাউন্সিল থেকে রেসিডেন্স পারমিট নিয়ে আসার জন্য। মাত্র মাসখানেক পরিচয় তার মধ্যে আমার মতো একজন অপরিচিত ছেলের জন্যে এতোগুলো টাকা দিবেন আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি। পরে আমার রুমমেট-এর কাছে জানতে পারি দুইদিন আগে কাজ শেষ করে আসার সময় মামা ওনার বন্ধুর রেস্টুরেন্টে যান, সেখানে আমার রুমমেট কাজ করতো। কথা প্রসঙ্গে আমার রুমমেট উনাকে বলেন আমার সমস্যার কথা এবং তারপর যা হয় তা তো বললাম।

মিউনিখে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে সব সময়, আসলে আমার কোনো ধারনাই ছিল না। আমি যে জুতা নিয়ে এসেছিলাম তা এরই মধ্যে ফুটো হয়ে গেছিল বরফের মধ্যে ফেলে রাখা পাথরের কারণে। আমার যে জ্যাকেট ছিল তা কোনোভাবেই জার্মানির উইন্টারের জন্য পর্যাপ্ত ছিলনা। মামা আমাকে নিয়ে একটা জামা কাপড়ের দোকানে গেলেন, ওখান থেকে একটি জ্যাকেট আমাকে কিনে দিলেন, যেটা আমার জার্মানিতে কাটানো ছয় বছর শীতকালীন সঙ্গী ছিল।

সেই ২০০৫ থেকে শুরু, আর আজ এ পর্যন্ত ছোট হোক, বড় হোক, কত রকম কত সমস্যা বিনা বাক্যে সব সময় পাশে ছিলেন এবং এখনো আছেন আমার সোহেল মামা। তার সকল উপকারের বর্ণনা দিতে গেলে কত পৃষ্ঠায় শেষ হবে জানিনা। কখনো কোন প্রতিদান দেয়ার সুযোগ হয়নি। বাঁধন এখন ক্লাস টেন এ পরে, আল্লাহর রহমতে পড়াশুনায় সে খুবই ভালো করছে। বাঁধনে পর মামীর আরো দুটো ছেলে (রাশেদ ও রাফাত) হয়েছে, রাশাদ ক্লাস সিক্সে আর রাফাত ক্লাস থ্রীতে পরে। মামী এখন অসুস্থ, প্রাণবন্ত সেই মানুষটি এখন আর পরিবারের বাইরের কাউকেই চিনতে পারেন না, এমন কি আমাকেও না। পরম করুণাময়ের কাছে এই দোয়া করি, মামার মতো ভালো মানুষকে পরম করুনাময় যেন সবসময় সহি সালামতে রাখেন এবং আমার মামী কে যে সুস্থ করে তোলেন ও দীর্ঘায়ু দান করেন।

- রাসেল, গনিত - ৯৯

"গল্পের" গল্প

বাঙালী মানেই রসনা বিলাস। বৃষ্টি মানেই খিচুড়ি - ইলিশ, শীত মানেই পিঠা, দাওয়াত মানেই শাহীখাবার, অবসর মানেই চা-সিঙ্গারা! আর প্রতিদিন অন্তত একবেলা ডাল-ভাত, ভর্তা-মাছ। আর এই দূরদেশে - দেশি স্বাদ মানেই "গল্প"। আমি কেন বলি এইকথা যে "গল্প" কোনো সাধারণ খাবার বিক্রির পেজ নয়, গল্প স্বপ্ন বিলায় আপনাদের মাঝে। আর এই স্বপ্নের শুরু - যখন কোর্মা খেতাম, রোস্ট এর নাম করে, বা এখানে রেস্টুরেন্ট গুলোতে খিচুড়ি খেয়েছি কাচ্চি বিরিয়ানির ট্যাগ এ। স্বপ্নটা শুরুহয় যখন দেখেছি সিদ্ধ চানা ডাল এ একটু টক ও জিরার গুঁড়া মিশিয়ে চটপটির নাম দূষিত হতে। গল্পের শুরু এই ক্ষুদ্র আবেগ থেকে, যেন সঠিক খাবারটি তার সঠিক উপকরণে সাজে আর ভোজনরসিকরা তৃপ্ত হয় সঠিক স্বাদ পেয়ে।

যদি বলি "গল্প" সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি পদক্ষেপ তাতেও কোন ভুল নেই বা নেই কোন শংকা। কারণ উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ দেশি-বিদেশী ভোজনরসিকদের তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে আর পৃথিবীতে "বাংলাদেশী" খাবার বলে যে অতিসুস্বাদু খাবার আছে সেটা জার্মান সমাজে পরিচয় করে দিতে।

তখন সবে জার্মানি এসেছি, এখানে এমন কোন দেশী রেস্টুরেন্ট পাইনি যেটা সম্পূর্ণ দেশী নাম এ দেশী অথেন্টিক স্বাদের খাবার পরিবেশন করে। কয়েকমাস পরের কথা, বার্সেলোনা বেড়াতে গেলাম দুই টোটো কোম্পানি পরিবার মিলে, ফেরার দিন এয়ারপোর্ট-এর পরিবহন বাস আসতে একঘন্টা লাগবে বলে আমরা একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম কাউন্টারের পাশের মল-এ। একটা পাকিস্তানী রেস্টুরেন্ট-এ বিরানি পাওয়া যায় দেখেই আমরা ঘড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে বসে গেলাম, খাবার যখন পরিবেশিত হলো, সেটাকে ঠিক কি নাম দেব খুঁজে পাচ্ছিলাম না, বাংলা সংবিধান মনে মনে আউড়াচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম কি জিনিস খাচ্ছি বাবা! নাম কি এটার! বাসমতি চাল দিয়ে আর মুরগির বুকের গোশতের কিছু টুকরা দিয়ে যে "ম্যাগি ভাত" রান্না করা যায় এই প্রথম শিখলাম! জীবনে ওই ছিল আমার প্রথম বড় একটা অভিজ্ঞতা যে কিভাবে একটা রেসিপির সর্বস্ব কেড়ে নেয়া হয়! বিরিয়ানির ট্রমা থেকে মুক্তি পাওয়ার আগেই আবিষ্কার করলাম আমাদের বিমানের পরিবহন বাসটি আমাদের চার খাদককে রেখে চলে গেছে, হায় আফসোস সেখান থেকে এয়ারপোর্ট ১০৩ কিলোমিটার পথ, আর আমাদের কারো কাছেই বিরিয়ানির বিল দেয়ার পর কোন খুচরো টাকা নেই যে ট্যাক্সি ভাড়া দেব! বিদেশে তখন নতুন, নেই কোন ক্রেডিট কার্ড আর স্টুডেন্ট একাউন্ট এ মাসের শেষে কার কত সেন্ট জমা থাকে সেটা সবাই জানে! সামনে আমাদের ফ্লাইট ছেড়ে যাবার হাতছানি, রুবেল বরাবরই একটু সময়োপযোগী বুদ্ধিমান ছেলে, কিভাবে যেন একটা বাসড্রাইভারকে পটিয়ে ফেললো আর সে আগের বাস টিকেট দিয়েই আমাদেরকে বাসে নিতে রাজি হলো। সেবার ফ্লাইট এর দরজা বন্ধ করে দিলেও ইমিগ্রেশন থেকে ফোন করে দরজা খুলে আমাদের বিরিয়ানি খাদকদের যাত্রাসঙ্গী করতে পাইলট বাধ্য হয়। আমার মনের মধ্যে সেদিন তখনও বিরিয়ানির সর্বস্ব লুন্ঠনের গল্প চলছিল।

এরপরে রোমে গিয়ে একদম পুরোদস্তুর দেশি অথেন্টিক রেস্টুরেন্ট এর খাবার খেয়েও বিমান আমাদের ছেড়ে উড়ে যাচ্ছিলো, তারমানে দাঁড়াচ্ছে দেশি খাবারের নাম শুনলেই বাঙালী মনে দোলা লাগবেই আর সেই দোলা কখনো রসনায় তৃপ্তি দেবে বা কখনো করবে ব্যাথিত করবে - কখনো ছেড়ে যাবে বাস, ট্রেন বা বিমান। ভোজনরসিকদের থালায় সঠিক স্বাদের সঠিক রেসিপিটি পৌঁছে দিতেই আমাদের "গল্পের" শুরু - গল্প ক্যাটারিং এন্ড বেকারী, বার্লিন। পেশায় আমি একজন ডাটা সাইন্টিস্ট, কাজ করছি লাইবনিজ ইনস্টিটিউট এ ফেডারেল গভমেন্টের একটা নয় বছরের প্রজেক্টে, চাকরির জন্য আমাদের বাসার অবস্থান বার্লিন সেন্টার থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে। ২০১৯ এ স্থানীয় ৪টি জার্মান ফেস্টে বাংলাদেশী খাবারের ষ্টল দিয়ে স্থানীয় মানুষদেরকে পরিচয় করেছি পৃথিবীর অতি সুস্বাদু কিছু খাবারের সঙ্গে, এরপর আমাদের পথচলা শুরু। গতবছর কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করে আমরা পুরোদস্তুর ক্যাটারিং সার্ভিস শুরু করেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

শুরুর প্রথম সপ্তাহেই আমাদের ফেইসবুক পেজ (@golpocateringberlin) বার্লিন এর বাংলাদেশী পাড়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলে| আমরা যেহেতু বার্লিন শহর থেকে অনেকটাই দূরে থাকি তাই আমরা সপ্তাহ জুড়ে দূরের আবদারগুলো সংগ্রহকরি এবং শনিবার বিকালে বার্লিনের দুইটি স্থানে সেগুলো বিতরণ করি| মানুষকে বাসায় দাওয়াত করে খাওয়ানোর রান্না এবং যখন ব্যাবসায়িক রান্নার ব্যাপারটার মধ্যে অনেক ব্যবধান, কেউ যখন খাবার কিনে খাবে, তখন তাকে সঠিক স্বাদের খাবারটিই দিতে হবে| আলহামদুলিল্লাহ, এখন পর্যন্ত সবাই তুষ্টিচিত্তে আমাদের বিয়েবাড়ির মেনু গুলি, পিঠা, মিষ্টি আর দেশী খাবারগুলির জন্য অধিরাগ্রহে সপ্তাহ জুড়ে অপেক্ষা করেন এবং আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই শুক্রবার রাত আর শনিবার সকাল মিলিয়ে প্রায় ২৩/২৪ ধরণের খাবার রান্নাকরি| এইভাবেই পরিবর্তন আসে আমাদের লক্ষে, কাজে, স্বাদে। আর সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন বার্লিনে দল বেঁধে বাঙালিরা পরিবার আর বন্ধুদের নিয়ে কোন বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট-এ খেতে যাবে (এটা আমার এক ভোজনরসিক বন্ধুর কথা)|

গল্প বার্লিন - এর আরেকটি উদ্যোগ প্রিয় দেশকে ঘিরেও চলছে, যারা আমরা দেশ থেকে, পরিবার থেকে, যোজন যোজন মাইল দূরে এই বিদেশ ভুঁইয়ে এসে থিতু হয়েছি, তারা সবসময় চায় দেশে থাকা প্রিয়জনকে কিছু একটা উপহার দিয়ে চমকিত করবে, আর সেটা যদি হয় মায়ের হাতের রান্না করা খাবার তাহলে তো কথায় নেই| সেজন্যই গল্প - বাংলাদেশ একটি উদ্যোগ, কেউ বিদেশে বসে যেকোনো ধরণের খাবার অর্ডার করে শুধুমাত্র ঢাকায় তার প্রিয়জনকে উপহার পাঠাতে পারেন, আবার কেউ দেশ থেকে শুধুমাত্র বার্লিনে তার প্রিয়জনকে খাবার উপহার দিতে পারেন| গত কয়েকমাস আমাদের দুই পেজ থেকেই সবাই এভাবে উপহার পাঠাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ| "গল্প বাংলাদেশ" উদ্যোগটির আরেকটি দিক হলো দেশ এ প্রায় প্রতিটি পরিবারেই মা এবং বোনরা সারা জীবন আমাদের ফয়ফরমাশেষ পালনকরেই জীবন পার করে দিলো, তাদের অনেকেরই একটা আফসোস থাকে "ইশ, যদি নিজের ছোট্ট একটা ব্যবসা হতো!" এই ইশ-কে বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলে "গল্প বাংলাদেশ" উদ্যোগের হাল ছেড়ে দিয়েছি আমার প্রিয় আম্মা আর বোনদের উপরে| আলহামদুলিল্লাহ, তারা নিজে কিছু একটা করার প্লাটফর্ম পেয়েছে|

আর এতো সবকিছুর কারণেই আমাদের উদ্যোগের নাম "গল্প"| সবার নিজের একান্ত কিছু গল্প থাকে - কেউ বলে আর কেউ শোনে আর কেউ বাস্তবায়িত করে| সবার নিভৃতের গল্প বাস্তবায়িত হক| আল্লাহ সবার সহায় থাকুন।

- মুকিত, নগ্রাপ ০২

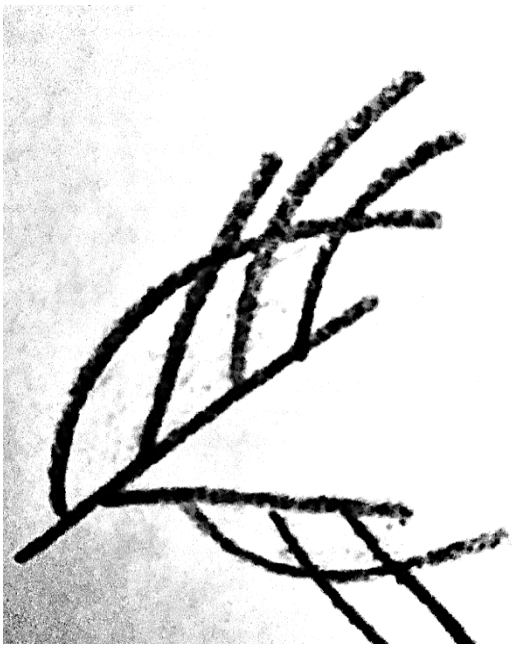

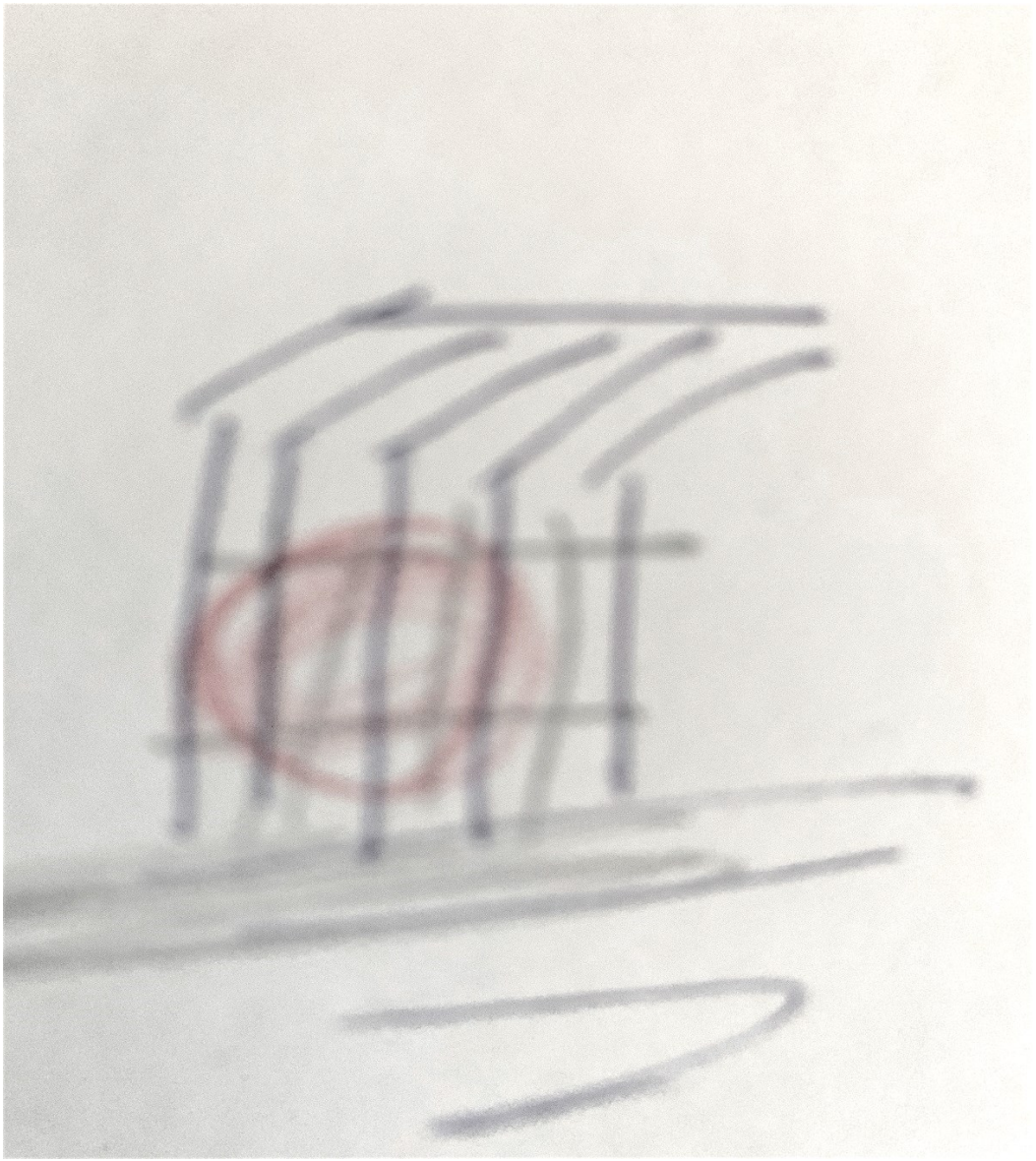

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

লোহার টুকরা

আমাদের বাড়ীতে একটা বিশেষ বালিশ ছিল। বালিশটার নাম ছিল- লোহার টুকরা। বালিশেরও আবার নাম হয় নাকি? হয়, নিশ্চয়ই হয়। প্রথমে আপনাদের লোহার টুকরা নামের ইতিহাসটা বলে নিই, তাহলে বুঝবেন। আমাদের ছোটবেলায় শীত আসার আগে আগে বাড়িঘরে লেপ তোশক বানানোর একটা ঝুম পড়ত। সে রকম এক শীতের আগে বাবা বললেন- "এইবার তো নতুন লেপ আর কিছু বালিশ বানানো দরকার।" যেমনি বলা তেমনি কাজ। তিনজন কারিগর বাসায় চলে আসলো, কাজ চলতে লাগল। বাবা একটু গোপনে আমাদের সাথে পরামর্শ করলেন,"ঠিক করেছি তোদের মায়ের জন্য একটা অরিজিনাল শিমূল তুলা দিয়ে একটা খুব ভালো বালিশ বানিয়ে নিব। বেচারি সারাদিন এত খাটা খাটনি করে। একটু আরামে ঘুমাবে। কি বলিস?" আমরা তিন ভাইবোন বললাম," ঠিক, ঠিক। নিশ্চয়ই স্পেশাল বালিশ দরকার!"

মহা উৎসাহে বালিশ বানানো হল। কারিগর যত তুলা দেয়, বাবা আরও বাড়িয়ে দেন। এক পর্যায়ে বেচারা বলল, "স্যার, এত তুলা দিলে আরাম হইত না"। বাবা বললেন," এইটা স্পেশাল শিমূল তুলা। মনে হবে হাওয়ায় ভেসে আছি।" বালিশ বানানো শেষ হল; বাবা মহা উৎসাহে বালিশ নিয়ে মা কে উপহার দিতে গেলেন! আমরাও গেলাম পিছু পিছু। মা বললেন, "বালিশ উপহার দেয়ার কি আছে?" বাবা বললেন, "বুঝবে, বুঝবে। একরাত এই বালিশে ঘুমিয়ে দেখ, বুঝবে এর মাহাত্ম্য"

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুঝলাম আবহাওয়া খারাপ, বিপদ সংকেতও আছে! ঘটনা কি জানতে ইরাকে ইশারা করলাম। বলল মা'র মেজাজ খুব খারাপ, রাতে নতুন বালিশে ঘুমিয়ে ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যাথা, মাথা নাড়াতেও পারছে না। মা বললেন, "কোন আক্কেলে এরকম একটা শক্ত লোহার টুকরা বালিশ বানালে?" বাবা মিনমিন করে বললেন, "আমার মনে হয় তোমার এমনিতেই ঘাড়ে ব্যাথা করছে। বালিশের দোষ হবে কেন? স্পেশাল শিমূল তূলার বালিশ!" "তাহলে তুমিই তোমার বালিশে ঘুমাও" বিরক্ত হয়ে মার জবাব। আমরা তিন ভাইবোন বললাম, "ঠিক, ঠিক। বাবা, তুমিই ঘুমাও।" বাবা বললেন,"তথাস্তু। দুনিয়ায় ভালো জিনিসের কোনো কদর নাই! যা, আমিই ঘুমাব।"

পরদিন সকালে দেখি ইরা বাবার ঘাড়ে মালিশ করছে আর গরম সেঁক দিচ্ছে। আমি বাবাকে বললাম,"বাবা কি ঘটনা?" বাবা বললেন, "নতুন বালিশ তো। তাই একটু প্রবলেম হচ্ছে।" এরপর থেকে এই বালিশের নাম হয়ে গেল 'লোহার টুকরা'। কেউ আর বেচারা লোহার টুকরাকে নেয় না। বাসায় অনেক মেহমান আসলেও আমরা কেউ লোহার টুকরাকে নিতে চাই না। প্রয়োজনে বালিশ ছাড়া ঘুমাব, বাবা মাফ চাই।

তবে আমরা তিন ভাই বোন লোহার টুকরাকে কিছু মহৎ কাজে লাগাতে শুরু করলাম। আমাদের বাসায় সব সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে মেহমান আসতেন। মেহমান মানেই তো হৈহৈ রৈরৈ! কিন্তু সব মেহমানকে যে ভালো লাগত হলফ করে বলতে পারছি না। আমার এক ফুপা ছিলেন। যিনি খাবার টেবিলে বসে কঠিন সব ট্রান্সলেশন ধরতেন। না পারলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান করুন অবস্থা নিয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য দিতেন। আমাদের দুই ভাই এর জীবন ঐ সময় সত্যিকার অর্থেই তেজপাতা হয়ে যেত। সেই বার ফুপা আসার সাথে সাথে ইরা কে বললাম, "ফুপার একটু আরামে ঘুম দরকার। লোহার টুকরা..."

লোহার টুকরার ১০০% সাকেসেস রেট! অব্যর্থ, কোনো মিস নাই। ফুপা ঘুম থেকে উঠে ঘাড় নাড়াতে পারেন না। ঘাড় বাঁকা করে বাথরুমে যেতে গিয়ে দরজায় মাথা ঠুকে মাথায় আলু বানিয়ে ফেললেন! নাশতার টেবিলে এসে কোনমতে বসলেন। মা কে বললেন, "অমন শক্ত বালিশেতো আমার বাপের জীবনে আমি ঘুমাই নি!" মা রক্তচক্ষু করে ইরার দিকে তাকালেন। ইরা নির্বিকার ভঙ্গীতে মাকে বলল,"মা, ভুলে গেছ? বাসার সব এক্সট্রা বালিশ পাশের জামিল চাচাদের বাড়ীতে নিয়েছেন। নীলা আপার বিয়ে না? ওদের বাড়ী ভরা মেহমান!" মা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নীলা আপার বিয়ে হয়েছে প্রায় ১০ বছর, উনার বাচ্চারা স্কুলে পড়ে। যাই হোক, ফুপার আর ট্রান্সলেশন ধরার মত শরীর বা মনের অবস্থা ছিল না।

লোহার টুকরাকে এর পরও আমরা তিন ভাইবোন কতবার অস্ত্র হিসাবে ব্যাবহার করেছি তার ইয়াত্তা নেই। আজ আমাদের বাড়ীতে সেই লোহার টুকরা আর নেই। জীবন-জীবিকার তাগিদে আমিও আজ অনেক দূরে! কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মাকে ছুঁতে খুব মন চায়। হাজার মাইল দূরে বসে মনে হয় আজ লোহার টুকরাকে এনে দিলেও আমি মহা আনন্দে মায়ের পাশে গুঁটি শুটি মেরে শুয়ে থাকতাম আর মা এর ঘ্রাণ নিতাম...!

.... মোর্শেদ, বিবিএ ৯৪

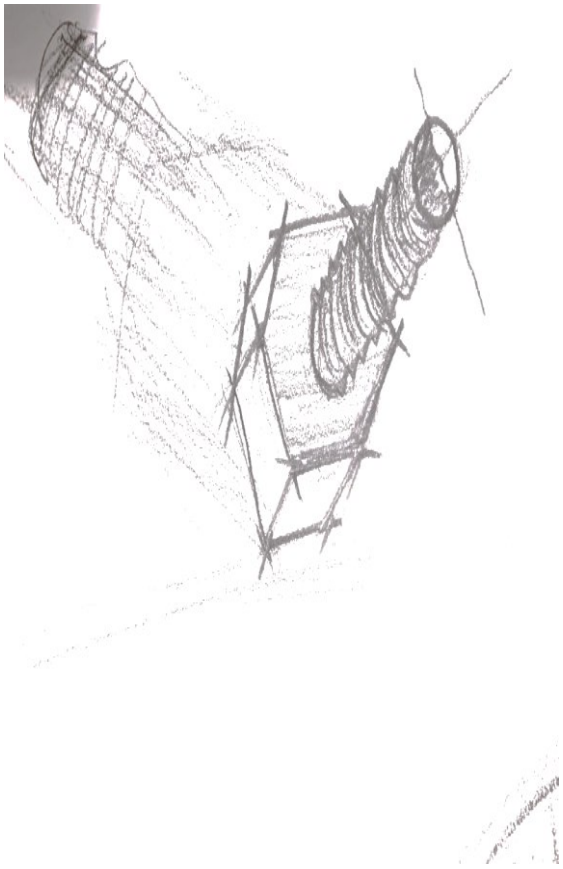

শুধু দেখব তোমায়

ছোট জেলা শহরে চাকরীর সুবাদে ভাড়া করা বাসায় বসবাস করে তারেক ও জীবন নামের সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা দুই যুবক। সুদর্শন যুবক তারেক কাজ করে একটি নামকরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি পদে। জীবন কর্মরত একটি সরকারী বিভাগের কারীগরী কর্মকর্তা হিসাবে।

শনিবার সকাল ১০টা। পাশের বাসা থেকে ভেসে আসছে সুমধুর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর আর সাথে একজন মহিলা গুনগুন করে কন্ঠ মেলাচ্ছেন। সাপ্তাহিক ছুটির কারণে তারেক ও জীবন দুজনেই বাসায় আছে। জীবন ঠাট্টার ছলে তারেককে বলে, এটি অবশ্যই মহিলা প্রতিবেশী তার সুদর্শন চেহারায় মুগ্ধ হয়ে করছে। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাটি তিন বছরের একটি বাচ্চা নিয়ে একাকী বাস করে। তার স্বামী ব্যবসার কাজে প্রায়ই অন্য শহরে থাকেন। পরের দিন বিকেলবেলা প্রতিবেশী মহিলা নিজে থেকে পরিচিত হওয়ার জন্য তারেক ও জীবনের জন্য কিছু আম ও মিষ্টি নিয়ে আসেন। উল্লেখ করেন যে গতকাল তার স্বামী বাসায় এগুলো নিয়ে এসেছেন। জীবন এই বিষয়টিকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করছিল; তবে ভদ্রমহিলা তারেকের দিকে কিছু সময় চেয়ে থাকেন। জীবন কিছুটা মানিয়ে নিয়ে তারেককে বলল আসুন আমগুলোকে চেখে দেখা যাক মিষ্টি না টক। এসব হাস্যরসে দিনগুলো ভালই কেটে যাচ্ছিল তারেক ও জীবনের। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী মহিলা আরো কয়েক দফা ভালো নাস্তা খাবার দিয়ে গেলেন। এ নিয়ে জীবন তারেককে তার মিষ্টি চেহারা ও সুন্দর চাহনি জন্য কয়েকবার গুনো-গান করতে ছাড়ে না, তবে তারেক শুধু হাসে কোন উত্তর দেয় না।

রোমান্টিক সংগীত শুধুমাত্র আর সাপ্তাহিক ছুটির দিনেই নয়, কাজের দিনগুলোতেও রীতিমতো বাজতে লাগলো। গানের পরিব্যক্তি বাংলা থেকে হিন্দি সিনেমার গানেও প্রসারিত হল। ইতিমধ্যে, ভদ্রমহিলার শাশুড়িও তাদের সাথে থাকতে শুরু করেছেন। এক সাপ্তাহিক ছুটির রাতে জীবন বাসায় ছিল না,তাই একবারে রবিবার অফিস শেষ করে ফিরেছে। বাসায় ঢুকে সব জিনিসপত্র তছনছ অবস্থায় দেখে সাথে

সাথে তারেককে ফোন করে জানতে পারে যে তারেকও সেদিন রাতে বাসায় ফেরেনি। পুরো বাসায় সব খোঁজাখুঁজির পর দেখা যায়, তাদের নগদ টাকা ও ইলেকট্রনিক্সের জিনিসপত্র সব নিয়ে গেছে। তারেক ও জীবন এ ঘটনাটিকে সাধারণভাবে চুরি হিসেবে মানতে নারাজ, আর সেজন্যে তারা থানা পুলিশ - এর সহায়তায় কিছুদিন খোঁজাখুঁজি করে। এরই মধ্যে জীবন খবর পায় পরবর্তী মাস থেকে তাকে অন্য শহরে কাজের জন্য যোগদান করতে হবে। যার ফলে তারেক সিদ্ধান্ত নেয় সে একা একা এই বাসায় থাকাটা নিরাপদ মনে করছে না। একদিনের মধ্যেই বাড়িওয়ালার সাথে কথা বলে পরবর্তী মাস থেকে ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলেন বাসা ছেড়ে দেয় তারা। যদিও মাসের শেষ সপ্তাহ, তবে তারেক পরের দুদিনের মধ্যে একটি নতুন অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা করে।

সোমবার সকাল সাড়ে আটটা। তারেক ইতোমধ্যে অফিসের কাজে বাহিরে বেরিয়ে গেছে এবং নাস্তা শেষে জীবনও অফিসে যেতে প্রস্তুত। কেউ একজন দরজায় কড়া নাড়ছে। সে দরজা খুলে দেখতে পেল প্রতিবেশী ভাবীকে। তিনি অনুরোধ করে বললেন, আপনাদের বাসা ছাড়ার ব্যাপারে আমার কিছু জরুরী কথা আছে। জীবন চেষ্টা করলেন অফিসের ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে অন্যকোন সময় কথা বলার জন্য। ভদ্রমহিলা তাকে বলেছিলেন যে তিনি খুববেশি সময় নেবেন না। বিষয়টি খুবই জরুরী আর যেখানে শুধুমাত্র জীবনই পারে তাকে সাহায্য করতে। এ অবস্থায় জীবনের আর পালানোর পথ থাকলো না। ভদ্রমহিলা: আপনাদের বাসা পাল্টানোর সিদ্ধান্ত কি দয়া করে পরিবর্তন করবেন। আমি কি খুব বেশি জ্বালাতন করেছি? যদি করে থাকি, কথা দিলাম ভবিষ্যতে নিজেকে সংশোধন করে নিব।

মহিলা কিছুটা আবেগ তাড়িত হয়ে কান্না শুরু করলেন। জীবন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক করার জন্য বলল মূলত তার চাকরির বদলির কারণেই বাসা পরিবর্তন করতে হচ্ছে। তখন মহিলা অনুরোধ করলেন, জীবন যেন শুধুমাত্র তারেককে হলেও এই বাসায় থাকার জন্য রাজি করেন। জীবন আশ্বাস দিয়ে মহিলাকে বললে, সে চেষ্টা করে দেখবে।

একটু সামলে নিয়ে মহিলা জীবনের কাছে তার ব্যক্তিগত কিছু কথা বলতে শুরু করেন। দশ বছর আগের কথা তিনি তখন কেবলমাত্র কলেজে পড়েন, প্রায় সমবয়সী মামাতো ভাইয়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেছিল একজন সুদর্শন পুরুষ। পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। বছর খানেকের মধ্যে দুই পরিবার তাদের সম্পর্ককে মেনে নিয়ে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ছেলে ও মেয়ে দুজনেই প্রস্তুত হতে শুরু করে জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকে স্মরণীয় করে রাখতে। কিন্তু বিয়ের ঠিক আগের সপ্তাহে ঘটে যায় খুব একটা মর্মান্তিক ঘটনা। তার প্রিয়তম ব্যক্তি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যান। মেয়েটি ঘটনার আকস্মিকতায় মানসিক ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলে। অনেকদিন চিকিৎসার পর গত পাঁচ বছর হলো তিনি তার বর্তমান স্বামীর সাথে বিবাহিত। সংসার জীবন ভালোভাবে উপভোগ করছেন এবং তার বর্তমান স্বামীও তাকে অনেক সাহায্য করেছেন অতীতকে সামলে নিতে। ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি প্রায় তার অতীতকে ভুলে বেশ ভালোভাবেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেখানে নতুন একটা পরিবর্তন হয় যেদিন থেকে তারেক ও জীবন প্রথম তাদের পাশের বাসায় বসবাস করতে শুরু করে। অবাক হলেও সত্যি যে, তিনি তারেকের মধ্যে হুবহু তার হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মানুষটিকে অনেকটাই খুঁজে পান - তার চেহারা, তার কথাবলা, তার চাহনি আরো অনেক কিছু। গত দু'মাস যাবত, যখনই

তারেক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় অথবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলে, সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে ভদ্রমহিলা তাকে দেখতে শুরু করলেন। সময়গুলো খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়লেন যখনই তাদের বাসা বদলানোর খবরটা বাড়িয়ালার কাছ থেকে জানতে পারেন। তাহলে কি তারেককে আর আর দেখার সুযোগ পাবেন না। তিনি ভালো করে বুঝতে পারেন যে, সে তার স্বামী সন্তান নিয়ে যথেষ্ট সুখে আছেন এবং কখনোই ভুলেও চেষ্টা করবেন না তারেকের সাথে কোন যোগাযোগ করার। তবে তার একটাই চাওয়া যে যদি শুধু দূর থেকে হলেও তারেককে দেখে তার হারিয়ে যাওয়া প্রিয়মানুষের স্মৃতিগুলো মনে ধারণ করতে পারেন। তিনি এও চিন্তা করেছেন যদি ভবিষ্যতে তারেকের একটি মেয়ে সন্তান থাকে তাহলে তার সাথে আর নিজের ছেলেকে বিয়ে দিবেন। কথাগুলো শোনার পর জীবন বুঝে উঠতে পারে না, ভদ্রমহিলাকে তার কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। সে শুধু বলে,যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তারেককে বোঝানোর।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জীবন অফিসে ছুটে গেল এবং তারেককে ফোন করে জানালো যে আমাদের শিগগিরই কিছু জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তারেক ফোনে শুনতে চাইলো , তবে জীবন বলল, দু'ঘন্টা পরে আমার অফিসে আসুন। জীবন তারেককে সব পরিস্থিতি খুলে বলল এবং বুঝালো যে বাসা পরিবর্তন করার জন্য দুইদিন অপেক্ষা করা উচিত হবে না। সব শুনে তারেক বলল, সে আগে থেকেই ধারণা করতে পেরেছিল ভদ্রমহিলা বেশিরভাগ সময়ই লুকিয়ে তাকে খেয়াল করেন। কিন্তু বিষয়টিকে সে অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি যে এর পিছনে এরকম একটা ঘটনা থাকতে পারে। এমতাবস্থায় তারেক ও জীবনের সাথে একমত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসা পরিবর্তন করার। বিকেলেই যতটা সম্ভব নিরবে ও নিভৃতে তারেক ও জীবন বাসা পরিবর্তন করে। শেষ সময় তারেক ও জীবন দুজনেই দেখতে পায় ভদ্রমহিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে। তারেক ও জীবন একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে নিজেদেরকে মনে মনে প্রশ্ন করে করে -- এছাড়া বিকল্প কি করার ছিল তাদের?

- সুজিত, নগ্রাপ ০১

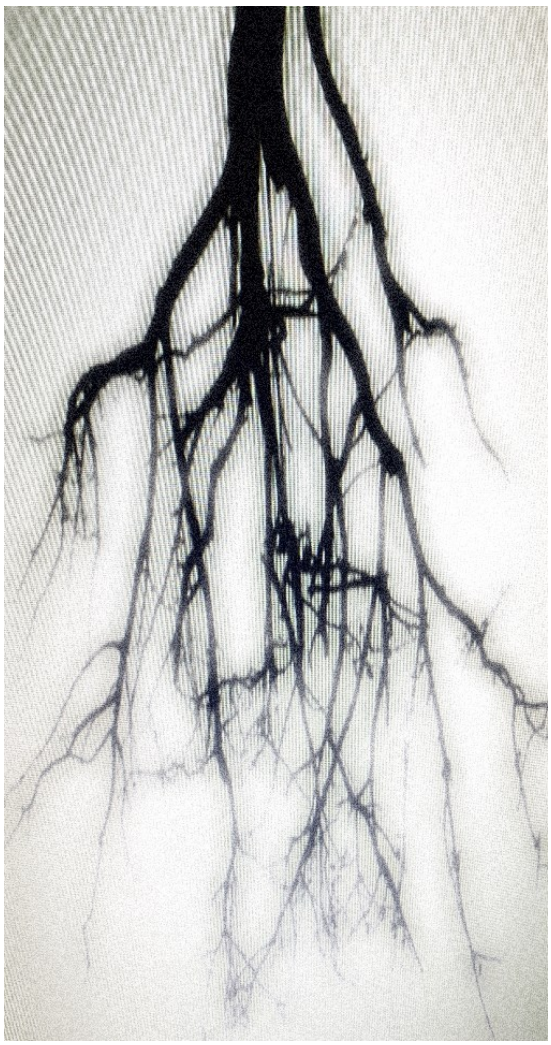

অহংকারের একুশ আমার

একুশ মানে একটি গল্প, টিকে থাকার লড়াই নিয়ে।
মায়ের মুখের ভাষা জন্য, সাহসী সেনার কাব্য নিয়ে।
ভালোবাসার উপমা দিয়ে, বুকের তাজা রক্ত ঝরে।
অনেক দামে পাওয়া সেতো, এক অহংকারের গল্প।
একুশ তুমি চেতনায় আমার, মিশে আছে অস্তিত্বে।
পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে, স্বকীয়তার জানান দিয়ে।
জাতিসত্তার বেড়ে উঠার, সাহসীকতার মন্ত্র নিয়ে।
রুপকথার জন্ম দেয়া, দিগন্তের এক সুচনা দিয়ে।
একুশ সেতো মায়ের ভাষায়, কথা বলার স্বাধিকার।
শিল্প সাহিত্য কৃষ্টিতে, এগিয়ে যাবার উন্মুক্ত দুয়ার।
মাথা নত না করে, চোখ রাঙানীকে পাশ কাটিয়ে,
নিজস্বতার প্রতিষ্ঠা, স্রষ্টা সেতো একুশেরই চেতনা।
আজ সে একুশ, সবার জন্য নিয়েছে এক নতুন রুপ।
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে, একুশ এখন সকল দেশের।
জাতিধর্ম নির্বিশেষ, মায়ের মুখের ভাষা রক্ষায়,
নিয়েছে এক নতুন শপথ, অহংকারের একুশ আমার।

সজীব, নগ্রাপ ৯৯

সম্পর্কের ভূচিত্র

সম্পর্ক,
এ যেন নদী
সদা বহমান,
দ্বীপের উত্থানে সম্পর্কের অবসান।

সম্পর্ক,
এ যেন সুউচ্চ পাহাড়;
শিখরের অক্সিজেন শূন্যতা টুটি চেপে ধরে।
চূড়ান্ত বিজয়ীর লক্ষ্য
শুধুই সমতল স্পর্শ।

সম্পর্ক,
এ যেন গভীর সমুদ্র।
গভীরতা ও পারিপার্শ্বিক চাপ
সদা সমান্তরাল;
যেমন সমান্তরাল চোখের অশ্রু এবং
অতলস্পর্শী ভালোবাসা।

- আশরাফুল, এস ডব্লিউ ই ০১

যাপিত জীবন

আজকে আমি ভালো আছি - কিন্তু, আজ
আমার লেখা দেয়ার দিন -
লেখা হয় নাই পুরোটা -
অলরেডি দেখলাম এসেছে কয়েকবার
তাগাদা।
কি লিখবো? অনেকদিন হয় নাই লেখা!
তার সাথে সাথে হল করোনা ভাইরাস-এর
সাথে দেখা।
সারা পৃথিবীতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে দিনকে
দিন
আর জীবন-জীবিকা হচ্ছে দিন দিন বিলীন
বিলেত-আমেরিকায় সব উন্নত দেশ হল
করোনায় কুপোকাত -
আমার গরিব দেশ বাংলাদেশ দেখিয়ে দিলো
এক হাত।
ভ্যাকসিন নামক জিনিসটা যেন অধরা -
যাদের আছে টাকা, কিনলো যত না লাগে
তারা।
সবাই বললো ভ্যাকসিন আসলে সব হবে
ঠিক
ভ্যাকসিন এল এখন শুনি একি দিক
বিদিক?
কেউ বলে ভ্যাকসিন নিয়ে হবে কেউ কুমির
কেউ বলে নিব না ভ্যাকসিন এতে শুধু
আছে পানি!
বাংলাদেশে ভ্যাকসিন নিয়ে হচ্ছে এক
তুঘলুকি কাণ্ড-
আসলেই সব কিছু কি নির্ঘন্ট?
এসব দেখে করোনাভাইরাস বলে,
ভ্যাকসিনে হবেনা কাম -
আগে নিজের বিবেক আর বুদ্ধির দেন
লাগাম।

- টগর, ফউটে ৯২

মহাজাগতিক ভণ্ডামি

মানুষ মানে কি?
হাত থাকবে, পা থাকবে, খাওয়ার একটা
মুখও থাকবে।
সেই মুখে আবার কথাও থাকবে,
দেখার জন্য চোখ থাকবে, ভালো মন্দের
বুঝ থাকবে।
বোঝার জন্য জ্ঞান থাকবে, বিচার বুদ্ধি
বিবেচনা থাকবে।
মানুষ মানে সবচে বড়, সবার উপর মনুষ্যত্ব
থাকবে।

নীতি থাকবে, আদর্শ থাকবে, বেঁচে থাকার
লক্ষ্য থাকবে।
আবেগ থাকবে, অনুভতি থাকবে,
ভালোবাসার কষ্ট থাকবে।
কষ্ট পেলে কান্না পাবে, আনন্দে সুখী হবে।
মানবতা আঘাত পেলে, মনুষ্যত্ব ডুকরে
কাঁদবে।

আমরা নিজেদের মানুষ ভাবি, কারণ
আমরা দেখতে মানুষ।
আমাদের আছে জ্ঞান বুদ্ধি, আমরা করি
রাজনীতি।
আমাদের আছে একটি পেট, সেখানে আছে
অসীম ক্ষুধা।
আমরা জানি কেনাবেচা, রক্ত হাড় হাড্ডি ও
মাংসের ব্যবসা।
অস্ত্রের ঝনঝনানি, ক্ষমতার দাপট।
বিনিময়ে নিরপরাধ মানুষের আহাজারি।

রাজনীতি ও অর্থনীতির কূটকৌশলে
সেখানে ভাই ভাইয়ের শত্রু।
ধর্ম জাতি বর্ণ সবকিছু যেন বিভাজনের এক
একটি অস্ত্র।
ক্ষমতার দাপটে আর বাণিজ্যের প্রয়োজনে
মানবতা ভুলন্ঠিতঃ
আবার প্রচারণায় সেখানেই মানবতার
জয়গানের ভণ্ডামি।

ক্ষমতা পাবার জন্য একপক্ষ লড়ে যায়,

আর পুড়তে থাকে মানবতা, বলী হয় মনুষ্যত্ব।
ক্ষমতায় টিকে থাকতে আর একপক্ষ লড়ে যায়,
রক্তধারা বয়ে যায় খেটে খাওয়া মানুষের, বিপর্যয়ে মানবতা।
গণতন্ত্র তবে কি শুধু রক্তচোষা রাজনীতির বলীর খেলা?
মানবতা, মনুষ্যত্ব বা নিজেকে মানুষ ভাবার প্রয়োজন নেই সেখানে?

- সজীব, নগ্রাপ ৯৯

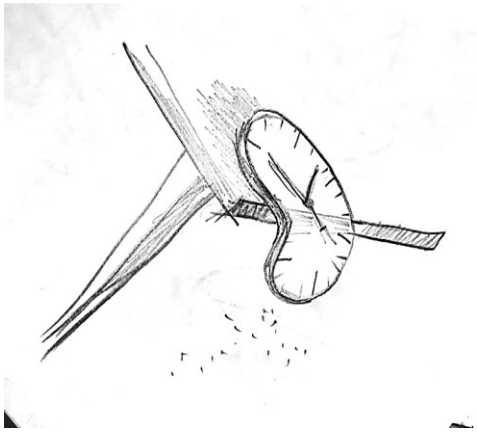

সময়

থেমে থাকে না সময়ের কাটা,
স্রোতে থাকে জোয়ার ও ভাটা।

ভেসে যায় - নোংঙর বাঁধে,
কেউবা রাখে হাত জীবনের কাঁধে।

ভাগ্যের স্রোতে - কেউ চলে যায়
দুর নিশানায়,
নিয়তির খেলায় ঐ নিলিমায়।

কেউ হাসে, কেউ কাঁদে,
তার নিজ নিজ ফাঁদে।
হায় রে হায় - বিধাতার খেলায়।

এ কেমন খেলা!
ভাসিয়ে ভেলা - কান্ডারী, সাজিয়ে মেলা -
ধরাধামে কেন এত ছলা?

সময়ের টান -
দিয়েছে মান - নিয়েছে প্রান!

মনে হয় বিধাতা অন্ধ!
তাই তো সময়ের রন্ধ্র - করে দেয় সব বন্ধ।

টিক টিক টিক -
সময়ই বলে দিবে - ঠিক কি বেঠিক।

- তৌহিদ, স্থাপত্য ৯১

করোনা ১৯

আমি করোনা -
কাউকে ধরি না।
সবাই আমাকে ধরে -
আর যায় মরে।

আমি আছি, থাকবো
সবাইকেই মাপবো।
আমি অতীব ক্ষুদ্র -
তবুও বৃহৎও রুদ্র।

আমি অসীম শক্তির আধার,
করোনা চেষ্টা আমাকে বাঁধার।
প্রকৃতিকে মানো, সত্যিকে জানো।
নিয়মকে আনো,অন্যায়কে হানো।

দৃষ্টি করো প্রসারিত,
হস্ত করো অবারিত,
কর্ণ করো অবহিত,
নাসিকা করো সুরক্ষিত,
বদন করো শান্ত,
প্রচলিত দলে,কর্মকৌশলে,
মানসিক বলে,সংকীর্নতা ভুলে।
তবেই পারবে, আমাকেই মারবে।
না হয় -- লড়বো আমি
আজন্ম দেহ দাস কুলে।
সাবধান!

যতদিন না পাবে ভেকসিন।
দিব শিক্ষা,

তত দিন না পাবে দিক্ষা।

আমি অতীব ক্ষুদ্র, দৃশ্যপটে জানে যে -
সে যন্ত্র অণুবীক্ষণ।
খালি চোখে তাই কেউ করেনা অবলোকন।
সাম্যবাদী আমি, জানিনে ভেদাভেদ।
দেখিনা, শুনিনা,
বুঝিনা, করিনা ছোটোবড়ো ভেদাভেদ।
যতই করো ছলাকলা -
দাম নাই তার আমার কাছে সিঁকি তোলা।

হে মনুষ্যকুল,
আমাকে চিনতে করেছ ভুল।
আমি করোনা -
তবে আমার ও আছে ভয়,
তৈল, দাহ্য ও রাসায়নিক ক্ষয়।
আমি বিধাতার সৃষ্টি,
মানবের অপকৃষ্টি।
আবির্ভাব হবো নানান রূপে -
যতদিন না চিনিবে আপন মাপে।

হয়তোবা হবো ক্লান্ত এই যাত্রায় -
যখন আসবে ভ্যাকসিন এই ধরায়।
শক্ত করো মনোবল,
আমার বিনাশের এটাই একমাত্র যাদুকল।

- তৌহিদ, স্থাপত্য ৯১

পথিক

পিয়াসী পথিক জল পেলো নাগো হায় -
সে যে চলে গেলো -
হলোনা অঞ্জলি পূজোয়!
সব পূজায় ভালোবাসা না মেলে,
চকিতে চকিতে আঁখি ভরে জলে।
ভেসে যায় তবুও লখিন্দরের ভেলা –
পূজারও আশায় বেঁচে রয় বেহুলা।

-শুভ, নগ্রাপ ৯৪

অভিসার

তুমি যবে ঘুমঘোরে স্বপ্ন বিহনে –
আমি সেথা মোদির নয়নে -
তোমার প্রতীক্ষায়!
কল্পনায় এঁকে যাই -
আলোময় চন্দ্রিল আকাশ – ঘাসের ঘ্রাণ।
বসি জানালা পাশে, অপেক্ষায় থাকি -
মুক্ত আলোয় - সুরের ঝংকারে,
তোমার আকাশে আমার অভিসারে!

- শুভ, নগ্রাপ ৯৪

রসনাবিলাস

রাশিয়ান গাজর সালাদ

ছবি: সাদিয়া

উপকরণঃ

গাঁজর ৫০০ গ্রাম (মিহি কুচি করে কাটা), মেয়নিজ ৩ টেবিল চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ টেবিল চামচ, লবন ১/২ চা চামচ, এবং সেদ্ধ ডিম্ ৪ টি।

প্রস্তুত প্রনালীঃ

১ টি বড় আকারের ফ্রাইং প্যান ভালো করে গরম করে তাতে ২ টেবিল চামচ রান্নার তেল দিতে হবে। তেল গরম হলে তাতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু নেড়ে কুচি করা গাজর এবং লবন দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে। রান্না বেশি তাপে করতে হবে এবং ঢেকে দেওয়া যাবে না। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাজর গুলো বেশি সেদ্ধ না হয়ে যায়, একটু কচকচে থাকতে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে। গাজর গুলো ঠান্ডা হয়ে আসলে তাতে মেয়নিজ এবং গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে সেদ্ধ ডিম্-এর সাথে পরিবেশন করতে হবে।

- সাহিদা আফরোজা, ডার্মস্টাড

চিকেন কোরমার রেসেপি

ছবি / মুশাররাত জাহান মুন

উপকরন:

৫০০ গ্রাম মুরগীর মাংস
২ টা পেঁয়াজ
২ চা-চামচ আদা + রসুন বাটা
স্বাদমতো লবণ
১ চা-চামচ ধনিয়া
১ চা-চামচ মরিচ গুঁড়ো
৪ চা-চামচ টক দই
৪ চা-চামচ কাজু বাদাম বাটা
১ চা-চামচ করে জায়েত্রী ও জায়ফল গুঁড়া
পেয়াজ বেরেস্তা
দুধ ২ কাপ
চিনি ১/২ চা-চামচ
কেওড়ার পানি ১/২ চা-চামচ
প্রয়োজন অনুযায়ী গোটা গরম মশলা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি
২ চা-চামচ ঘি

প্রস্তুত প্রণালীঃ

কড়াই-এ তেল গরম হলে
গরম মশলা ফোড়ণ দিয়ে, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে
একটু ভেজে নিয়ে আদা রসুন বাটা দিয়ে

ভালো করে কষিয়ে মাংস গুলো মিশিয়ে নিতে হবে।

ভালো করে কষিয়ে আগে পানি দিয়ে মিশিয়ে, রাখা মশলা (মরিচ গুড়ো, ধনিয়া গুড়ো) পেস্ট দিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ কষিয়ে, টক দই মিশিয়ে আরো কিছু সময় কষিয়ে দুধদিয়ে (১ কাপএর মত) ঢাকা দিয়ে ঢিমে আঁচে রান্না করতে হবে। প্রয়োজনে আরো এক কাপ দুধ দিয়ে ভালোমতো রান্না করতে হবে।

তারপর কাজু পেস্ট ও জয়িত্রি জাইফল গুড়ো দিয়ে ভালো করে ৩-৪মিনিট কষিয়ে নিয়ে চিনি ও কাচামরিচ ছিটিয়ে ২ চা চামচ ঘি দিয়ে ২-৩ মিনিট রান্না করতে হবে।

মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলেই কেওড়ার পানি দিয়ে, সাথে বেরেস্তা ছিটিয়ে চুলা বন্ধ করে দিয়ে, কিছুক্ষন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখলেই তৈরি হয়ে যাবে আপনার পছন্দের শাহী চিকেন কোরমা।

টিপস:

১)আপনারা শাহী কোরমা-তে কখনোই জিরার গুঁড়া ব্যবহার করবেন না এতে মাংসের রং কালো হয়ে যাবে জিরার গুঁড়া ব্যবহার করা না করাতে খাবারের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না।

২)আপনারা মাংস আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী টুকরা করে করতে পারেন

৩) আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী মসলার পরিমাণ কম-বেশি করতে পারেন যে বেশি ঝাল খেতে চান সে একটু বেশি ঝাল দেবেন যে ঝাল খেতে চান না সে ঝাল একটু কম দিবেন ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

- মুশাররাত জাহান মুন

আঙ্গুরের খাঁটা

মায়ের হাতের রান্না খেয়ে অভ্যস্ত বাঙালি সন্তানেরা বিদেশে এসে হয়ে হয়ে ওঠেন বিখ্যাত রাঁধুনি। লন্ডনের টমি মিয়া তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আমার ভিতর টমি মিয়ার মতো কোনো প্রতিভা নাথাকলেও দেশের প্রখ্যাত রন্ধন বিশারদ বেগম কেকা চৌধুরীর মতো নতুন কিছু রান্নার শখ মাঝে মধ্যে জাগে। উদাহরণ স্বরূপ - গেলো হেমন্তে নতুন স্বাদের খোঁজে রান্না করেছিলাম আঙ্গুরের খাঁটা (/ টক)। রান্নার পর স্বাদ পরীক্ষার পালা। ঘরের বিজ্ঞ বিচারক* এটার স্বাদ গ্রহণ শেষে ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আমি নিজেও এর স্বাদ-গন্ধে মোহিত হয়ে গেলাম। এককথায়, আঙ্গুরের খাঁটা ছিল অতুলনীয় (আমার বিবেচনায়) এবং আমার বিশ্বাস, এটা যদি আপনারা নিচের বর্ণিত রন্ধন প্রণালী অনুসরণ করে নিজেই তৈরী করেন তবে আপনাদেরও ভালো লাগবে।

উপাদান

- ১ কেজি টকমিষ্টি কালো আঙ্গুর (কালো না পাওয়া গেলে অন্য যেকোনো রঙের আঙ্গুর হলেও চলবে; নিজের বাগানের আঙ্গুর হলে স্বাদ ও সুবাস বেশি পাওয়া যাবে).
- ১০০ গ্রাম খেজুর বা আখের গুড়
- ২০ গ্রাম দারুচিনি
- ১ চা চামচ / পরিমান মতো লবন
- ৫০০ মিলিলিটার পানি

রন্ধন প্রক্রিয়া

- প্রথমে আঙ্গুর গুলো হাত/জুস মেকার দিয়ে চেপে রস আলাদা করুন
- এরপর আঙ্গুরের মণ্ডটুকু একটি পাত্রে ঢেলে তার ভিতর ৫০০ মিলিলিটার পানি যোগ করুন এবং পাত্রটিকে ঢেকে রেখে অল্প আঁচে ২৫-৩০ মিনিট ধরে তাপ দিন / রান্না করুন
- এরপর গুড়, লবন ও দারুচিনি যোগকরুন এবং একই তাপে আরো ৫-১০ মিনিট রান্না করুন এবং সবশেষে চুলা বন্ধ করে চুলার উপরে পাত্রটিকে রেখে দিন; এ পর্যায়ে আঙুরের খাঁটা তৈরী হয়ে গেলো। এখন তাপমাত্রা

সহনীয় হলে বা উষ্ণ গরম হলে পুর্বে সংগৃহিত আঙুরের রস মিশিয়ে পরিবেশন করুন।

বি:দ্রঃ উপরে উল্লেখিত খাবার/উপাদান গুলিতে কারো যদি এলার্জি থাকে, বা কারো যদি উচ্চ রক্তচাপ এবং/বা ডায়বেটিস থাকে, তবে এর স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

এ ছাড়া ঘরের বিজ্ঞ বিচারকও* মাঝে মধ্যে নতুন স্বাদের রান্না উদ্ভাবন করেন, যেমন - সদ্য গাছ থেকে পাড়া আধা কাঁচা-পাকা আপেল দিয়ে আপেল ভর্তা (সেদ্ধ আপেল), আপেলের টক-মিষ্টি আঁচার, বুনো কুলের আঁচার, এবং অভ্যাকেডো ভর্তা (সতেজ অভ্যাকেডো). আমার বিশ্বাস ইউরোপে অবস্থানরত অনেকেই এ খাবারগুলোর সাথে পরিচিত, আর যদি কেউ এগুলো না খেয়ে থাকেন তবে আমার পরামর্শ থাকবে যে, সুযোগ পেলে অবশই এগুলো রান্না/তৈরী করবেন।

*ড. নার্গিস পারভীন; Soil Science 03

ড. মাসুদ পারভেজ
(Soil Science 02) উপসালা, সুইডেন

সেমাই পিঠা

বাগেরহাট এবং খুলনা অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার

সেমাই পিঠা বাগেরহাট এবং খুলনা অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার। নাম একই হলেও এটি হাতে-কাটা মিষ্টি সেমাই পিঠা বা চুই পিঠা যা আমরা দুধ চিনি দিয়ে রান্না করি সেটির মত নয়। এই পিঠা হাসের মাংস বা অন্য যে কোন মাংসের সাথে খেতে অসাধারণ। অতিথি আপ্যায়নে এই পিঠা যেন না হলেই নয়।

উপকরণ:
চাউলের গুড়া ৬ কাপ
পানি ৪ কাপ
লবণ আধা চা চামচ
আরও লাগবে:
সেমাই পিঠা বানানোর মেশিন,
সেমাই পিঠা ভাপ দেওয়ার জন্য ছিদ্রযুক্ত ঝাঁজরি হাড়ি

পদ্ধতি:

১. একটি পাত্রে ৪ কাপ পানি ফুটান

২. পানি ফুটতে শুরু করলে লবণ ও ৬ কাপ চালের গুড়া যোগ করুন। এক মিনিটের জন্য পাত্রটি ঢেকে দিন , তারপর একটি খুন্তি দিয়ে নেড়ে একটি শক্ত লেচি তৈরি করে নিন , প্রয়োজন হলে অল্প পানি যোগ করুন। আটার লেচি স্বাভাবিক রুটি তৈরির লেচির চেয়ে শক্ত হতে হবে।

৩. এখন চুলা থেকে সরিয়ে নিয়ে আটা যথেষ্ট ঠাণ্ডা হতে দিন যেন হাত দেওয়া যায়।

৪. আটা গরম থাকতে থাকতে ভাল করে মথে নিন।

৫. ছোট সিলিন্ডার আকারের আটার দলা তৈরি করুন যেটা পাস্তা মেকার / সেমাই পিঠা মেকারের ভিতরে সহজেই ফিট হবে।

৬. এবার সেমাই পিঠা প্রস্তুত করার মেশিন ব্যবহার করে পিঠা তৈরি করুন। (ছোট থেকে মাঝারি ছিদ্র যুক্ত ডিস্ক ব্যবহার করুন)

৭. তৈরি করার সময় পিঠার উপর সামান্য শুকনো চালের গুড়া ছিটিয়ে দিন যাতে সেমাই পিঠাগুলো একসাথে আটকে না যায়।

৮. এবার সেমাই পিঠা বাষ্পে সেদ্ধ করতে হবে।

৯. একটি পাত্রে কিছুটা পানি ফুটতে দিন

১০. সেমাই পিঠাগুলো একটি ছিদ্রযুক্ত ঝাঁজরি পাত্রের মধ্যে রেখে উত্তপ্ত পানির বাষ্পের উপর বসিয়ে দিন যেন পিঠা নিচের পানিতে না লাগে।

১১. ঢেকে দিয়ে ৫-৬ মিনিটের জন্য সেদ্ধ হতে দিন।

১২. এর পর নামিয়ে নিয়ে গরম সেমাই পিঠার উপর ১ - ২ টেবিল চামুচের মত ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিন, এতে করে পিঠা ঝরঝরে হবে ও নরম থাকবে।

১৩. যেকোনো মাংসের সাথে গরম গরম পরিবেশন করুন।

১৪. বেচে যাওয়া সেমাই পিঠা ঢেকে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে পারবেন । পরিবেশন করার আগে মাইক্রোওয়েভ করে বা বাষ্পে এটি গরম করে নিন।

- মেরিনা জাহান

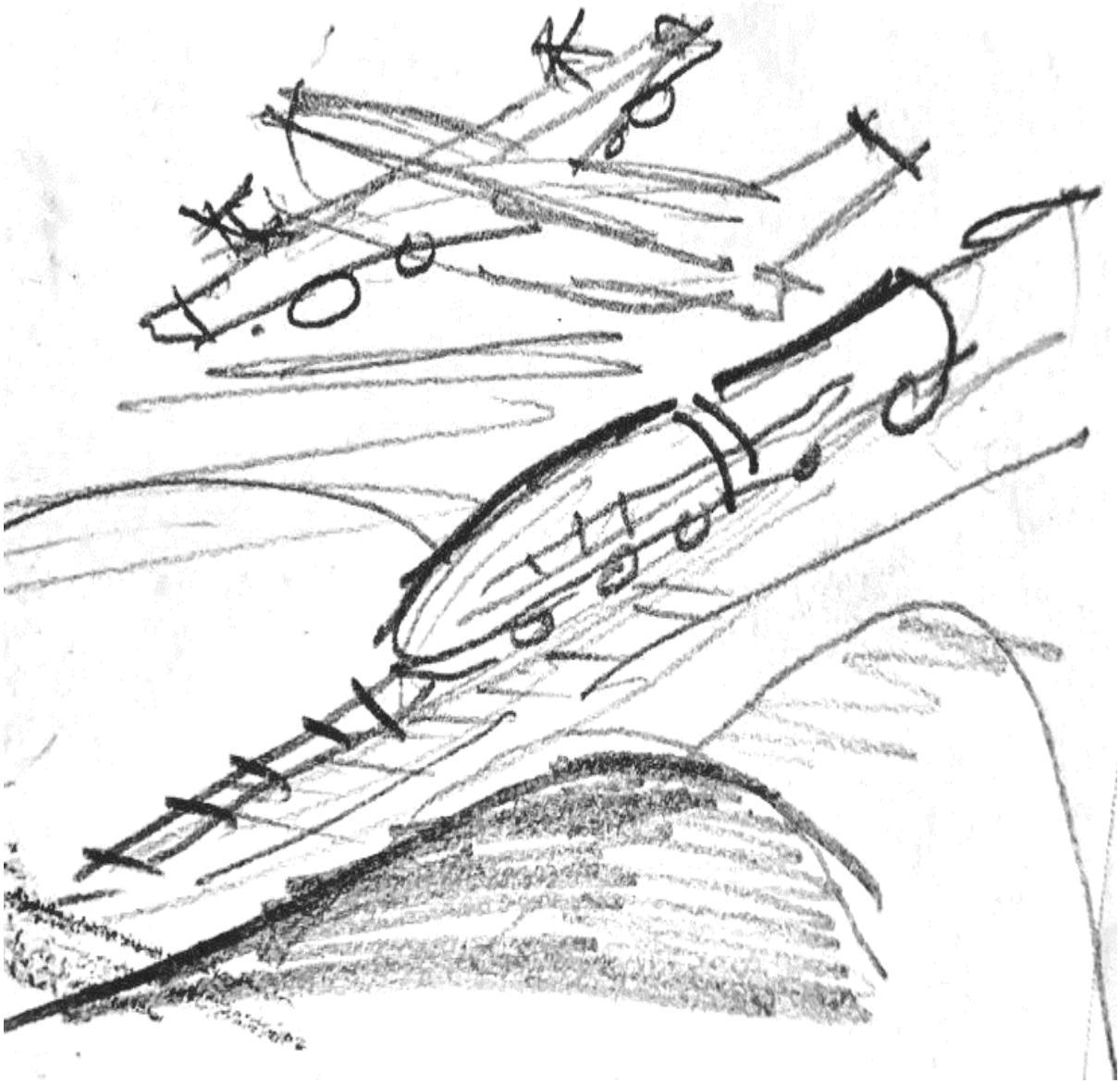

ভ্রমণকাহিনী

বডি পাস – থ্রি মাস্কেটিয়ার্স

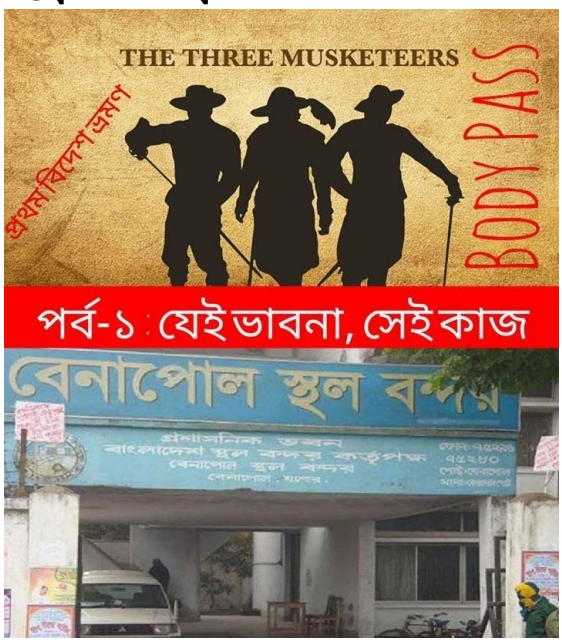

পর্ব-১ : যেই ভাবনা, সেই কাজ

স্থাপত্যের স্নাতকে চতুর্থ বর্ষে শিক্ষাসফরে ভারতে যাবার একটি রীতি সচরাচর চালু থাকে, আমাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি, স্থাপত্যের ভর্তি কোচিং করিয়ে আর্থিক সংকুলান, ম্যাগাজিনের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহসহ ব্যক্তিগত পর্যায়ে আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করে যাবার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার পর, সবার পাসপোর্ট আর ভিসা করানোর দায়িত্ব আমার কাছে ছিল, পরবর্তীতে ডলার এন্ডোর্সমেন্ট ছাড়াও হুন্ডির ব্যবস্থাও করে দিতে হয়, খুলনা থেকে তখন হুন্ডি কলকাতাতেই ভাল হয়, মেয়ে ক্লাসমেটদের অনেকেই পরিবারের জন্য অনেক কিছু কেনার তাগিদে এমনকি অনেকে বিয়ের শপিং এর জন্য অনেক টাকা হুন্ডি করতে চায়, সব মিলিয়ে তো পাঁচ-ছয় লাখ টাকার মতোই হবে, ১৯৯৮ সালে ওই টাকার মূল্য অনেক, পিকচার প্যালেসের ওখান থেকে হুন্ডি করলে একটি স্লিপে একটি ফোন নাম্বার ধরিয়ে দিল, শহরের রাজনৈতিক ও অন্যান্য নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ ভালই ছিল তাই টাকা মাইর যাবে না এতটুকু নিশ্চিত ছিলাম, তদুপরি মনে কিছুটা খুচখুচি ছিল, কলকাতায় সম্রাট হোটেল বুকিংটা খুলনা থেকে আমিই দিয়ে দিয়েছিলাম, প্রথম দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে সবাইকে বর্ডারে বেনাপোলে পৌঁছে দিয়ে আমরা ফেরত আসি, কারণ শিক্ষক হিসাবে যিনি সাথে যাবেন তার তখনও ভিসা হয়নি, পরেরদিন ওনাকে নিয়ে আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন বেনাপোল বর্ডার ক্রস করবে, অনেক দায়িত্ব নিলেও শেষ অবধি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে শিক্ষা সফর থেকে বিরত থাকি, তদুপরি পরেরদিন বাকি দুজনকে বেনাপোলে নামিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরের ব্যাচের আরও দুজনকে নিয়ে যাত্রা করি, ওদেরকে বর্ডারে বিদায় জানিয়ে পাশে চায়ের দোকানে চা খেতে বসলে মনে খুচখুচানি টা একটু বাড়তে থাকে, 'যদি হুন্ডির টাকার কিছু হয় টাকা ফেরত পাওয়া যাবে কিন্তু ওদের স্বপ্নগুলো তো আর পূরণ হবে না' আমি তখন পরের ব্যাচের দুই জন - অপু আর শান্তর সাথে আলাপ করছি যে ওপারে যাওয়া যায় কিনা; আমার দুশ্চিন্তাটা তাদেরকে জানালাম

অপুঃ (চায়ের দোকানদারের উদ্দেশ্যে) ভাইডি, ওই পাড় যাওয়ার সিস্টেম টা কি? (বলে রাখা ভাল যে, অপু যথেষ্ট ভাল একজন সংগঠক আর অভিনয়ে পারদর্শী)

চাওয়ালাঃ (বয়স ১৫-১৬ হবে) মালামাল আছে? নাকি বডি পাস্

শান্তঃ (শান্ত কিন্তু শুধু নামে নয়, সত্যিকারেই শান্ত স্বভাবের) বডি পাস্ কি রে?

চা-ওয়ালাঃ লাগে এই লাইনে নয়া, মাল সামাল না থাকলে, হুদা বডি লইয়া যাইবেন তো - তাইলে বডি পাস্
অপুঃ সিস্টেম ক

চা-ওয়ালাঃ (উঠে এসে) কয়জন যাইবেন?

শান্তঃ এইযে আমরা তিনজন
চা-ওয়ালাঃ ১৮০০ লাগবে...
আমিঃ বর্ডার দিয়া পাসপোর্টে গেলেইতো পারি, তিনজনে ৬০০ লাগবে...
চা-ওয়ালাঃ ৩০০ কইরা রেট দাদা, যাইতে ৯০০ আসতে ৯০০
আমিঃ আসারটা আসার সময় দেখবাণী, যাওয়ার বল, ৬০০ পাবি, আমরা সিনেমা দেখতে যাবো, পরশু দিন চলে আসব, ৬০০র বেশি পোষাবে না।
চা-ওয়ালাঃ দাদা, রেট ৩০০, BSF ছাড় দিবে না, তবে একটা কাজ করা যায় (একটু চিন্তা করে), আপনাদের ভিতর থেকে একজন আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে দেখানো যাবে, বলবো - কাজ শিখতেছে
শান্তঃ সমস্যা কি, কোনো সমস্যা নাই, আমরা বলে দিবানি যে আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট
চা-ওয়ালাঃ (অপুকে দেখিয়ে) উনারে অ্যাসিস্ট্যান্ট বানাইলে সন্দেহ করবে না,
অপুঃ কেন?
চা-ওয়ালাঃ আপনার চেহারায় একটা দালাল দালাল ভাব আছে
আমরা তিন জনই অট্ট হাসিতে ভেঙে পড়লাম, তখন ৫৫৫ এর চলন ছিল, আমি একাই তখন ধূমপান করি, অপু আর শান্ত ধূমপান মুক্ত, ওপারে ৫৫৫ পাওয়া যাবে কিনা এই সন্দেহে এক প্যাকেট সিগারেট চাইলে ছেলেটা বললো, 'BSF রাইখা দিবে দাদা, ও শালারা বহুত হারামি'
আমিঃ আসার সময় সিস্টেম কিরে?
চা-ওয়ালাঃ ওপারে এসে আমার নাম বললে, আমি গিয়ে নিয়ে আসবো
অপুঃ তোর নাম কি? ওহ্‌হো, তুইতো এখন আমার বস, আমি তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট (আবার অট্ট হাসি)
চা-ওয়ালাঃ আমার নাম ইমরান, BSF জিগাইলে কইয়েন 'রতন- রতন দাস''
বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো ড্রাইভার কে বিদায় জানিয়ে আমরা প্রস্তুত হলাম বডি পাস্ এ ওপার যাব, মাসের হাত খরচ হিসেবে ৩০০০ টাকা পেতাম, পকেটে ২০০০ ওদের কাছে মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ এর মতো সম্বল, আশাকরি হয়ে যাবে, ইমরান তার কাজ আরেক জনকে বুঝিয়ে আমাদের নিয়ে রওয়ানা হলো।

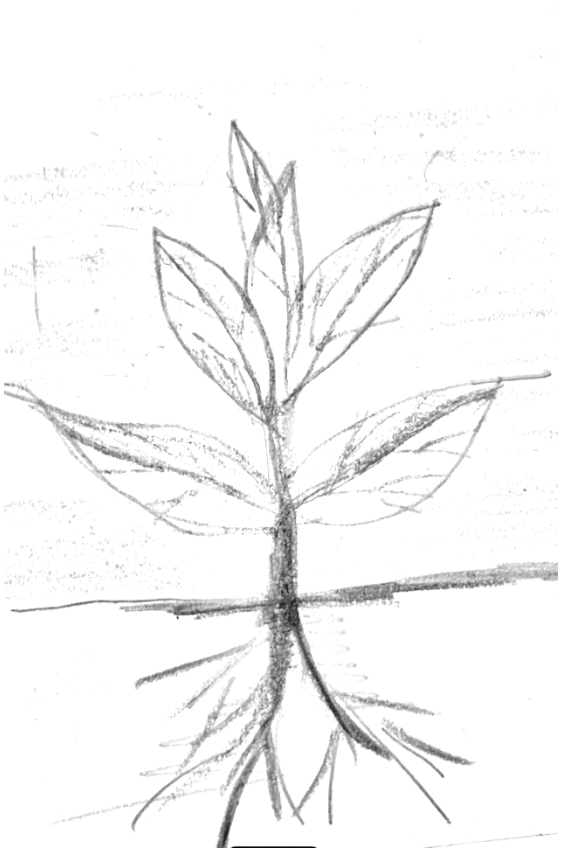

পর্ব-২ : বেনাপোল থেকে পেট্রাপোল

চায়ের দোকান থেকে বের হয়ে ইমরান আমাদের নিয়ে চেকপোস্টের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে বাম দিকে দুই দোকানের মাঝখানের একটি চিকন গলি দিয়ে হাঁটা দিল, আমরা বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাচ্ছি-
অপু- কিরে? সোজা রাস্তা রাইখে কোথায় যাচ্ছিস?
ইমরান- সোজা গেলে ভইরে দেবেনে, গেরাম গঞ্জ ঘুইরে জাতি হবে, থেমে থেমে বিশ্রাম নিতে নিতে জাতি হবে, BSF এর সময় মিলিয়ে পার হতি হবে, ঘন্টা দুই তিন লেগে যাবে নে-
শান্ত- কইস কি রে?
আমি- শাউও, খানা দানা করবানি কন্ডে (আঞ্চলিক ভাষাটা জানা ছিল, তাই চর্চা শুরু করে দিলাম)

অপু- তোরে কি বইলে ডাকবো?
ইমরান- উস্তাদ ডাকলিই হইপে- (খিক খিক)
অপু- হ উস্তাদ (ও বরাবরই রসিক টাইপের)
হাটতে হাটতে গ্রামের ভেতর চলে গেছি আমরা, ছনের চালের বেড়ার একটি ঘরে ইমরান আমাদের নিয়ে এসে মোড়া আগিয়ে দিয়ে উঠানে বসতে দিলো, টিউবয়েলের ঠান্ডা পানি সাথে মুড়ি আর গুড়, একজন বুড়ো উঠানের এক কোনায় বসে হুক্কা খাচ্ছে, ইমরান গেলো পরিস্থিতি বুঝতে, অনুকূলে থাকলে আবার রওয়ানা হবো, ১৫-২০ মিনিট পরে এসে বললো,
'চলেন, সামনে আরো স্টপেজ আছে, আজকে BSF একটু ঢিলা ঢালা লাগতিছে"
আবার রওয়ানা দিলাম, গ্রামের ভেতর দিয়ে, মাঠের আইলের উপর দিয়ে, সাঁকো পেরিয়ে, আরেক উঠানে এসে ইমরান থামলো, এখানেও এক প্রৌঢ় লোকের তত্ত্বাবধানে রেখে আবার সে লাপাত্তা, এবার উঠানের পাশে বারান্দায় পাটি বেছানো- তালের হাতপাখাও ছিল, এইবার মিললো মুড়ির মোয়া আর সেই টিউবওয়েলের ঠান্ডা পানি, এইবারের বুড়াটি তামাক খাচ্ছিলো, জিজ্ঞেস করলো-
'কোথায় যাওয়া হচ্ছে? বোচকা বাচঁকি কিছুই তো দেখছি না, টাকা পয়সা হুন্ডি করে দিয়েছো বাপুরা? আজকাল সবাই সেয়ানা, যায়ই হউক বাপুরা, সাবধানের মাইর নাই, নাক চোখ মুখ খোলা রেখে চলতি হবে, যাচ্ছ যাও, সহি সালামতে ফিরে আসো যেন, কেমন?'
যৌবনের জৌলসে তখন অনেক কিছুই কিন্তু মাথায় ছিল না, বুড়ো কি বললো কিছুই বুঝিনি, অনেক পরে এসে জেনেছি (প্রায় এক দশক পরে কোনো এক নাটক দেখে)- সীমান্তে অনেক সময়েই খাবারের মাধ্যমে অজ্ঞান করে ছিনতাই তো মামুলি ব্যাপার, কদাচিৎ আরো অনেক খারাপ ঘটনার উদাহরণ আছে-
আবারো প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর ইমরান এসে- 'BSF এর শিফট বদল হচ্ছে, জলদি চলেন'
আমরা একজন আরেকজনের দিকে চোখে ইশারা দিলাম, বুঝতে পড়লাম- ইমরান BSF এর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিজেই পুরাটা কামিয়ে নিচ্ছে, চালাকি করে আগেই অগ্রিম দেওয়া থেকে বিরত ছিলাম, আসলে আমাদের না গেলেও সমস্যা নেই, এইটা ও বুঝতে পেরে মেনে নিয়েছিল যে ঐপারে পৌঁছে টাকা নিবে, তড়িঘড়ি রওয়ানা দিয়ে এবার একটা চেকপোস্টার নিজ দিয়ে পার হওয়ার সময় BSF হুঙ্কার দিয়ে উঠলো-
'কিধার জাত হেয়?"
ইমরান- বেহেন কা সাদী হেয় না, উধার লিয়ে যা রাহাহু, দুদিন মে লউট আউনগা
BSF- সাদী কিধার হেয়?
ইমরান- বনগাঁও মে, হাম লোক বর্ডার মেই রেহতাহু, ইধার পে দুকান ভি হেয়, লওটকার আয়ুঙ্গা, পাক্কা-
দেখে মনে হলো পাঞ্জাবের লোক, যাই হউক- শিফট বদলের সময় বলে আর কথা না বাড়িয়ে ছেড়ে দিলো, আরো প্রায় আধা ঘন্টারও বেশি হেটে অবশেষে আবারো দুই দোকানের মাঝের ফাঁকা দিয়ে বড়ো একটা রাস্তায় পড়লাম, এই সেই রাস্তা যেটা কিনা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকেছে, বেনাপোল চেকপোস্ট ২০০-৩০০ গজ পেছনে, সরাসরি আসলে যেখানে লাগার কথা ৩০ মিনিট, সেই খানে লেগে গেলো প্রায় তিন ঘণ্টা, তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা বাজে, একটা হোটেলে বসে ইমরানের ৬০০ টাকা বুঝিয়ে দিয়ে পেট ভরে খেয়ে শুরু হলো body pass এর পরবর্তী মিশন- 'কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা'।

পর্ব-৩: পেট্রাপোল- বনগাঁ- শিয়ালদাহ

ওপারে পৌঁছেই কিন্তু দাদাদের ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করতে থাকলাম- 'কত হলো দাদা?' হোটেলে খেয়ে বাংলা টাকাতেই বিল চুকিয়ে দিতে পারলাম- কিন্তু পাঁচশো টাকার প্রথম নোটটা রুপী করে নিলাম- হোটেল থেকে বের হতেই-
ট্যাক্সিওয়ালা ১- কোথায় যাবে দাদা?

আমি- কলকাতা যাবো গো দাদা, আর কোথায় যাবো বলো?
ট্যাক্সিওয়ালা ১- ৫০০ রুপী লেগে যাবে যদি রিজার্ভ করে যেতে চাও, নয়তো তিন জন্য ৩০০ পরবে,
আমি- এতো সামর্থ্য নেইগো দাদা, অন্য কোনো উপায় দেখতে হবে দাদা (আমরা অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছি, যদি বন্ধুদের খুঁজে না পাই, তবে ২৪০০ টাকা সম্বল, ফিরে আসার জন্য যদি ৬০০ রেখে দেই তাহলে তো রইলো ১৮০০, হোটেল-খাওয়া দাওয়া সব মিলিয়ে বাজেট তো আহামরি মনে হচ্ছেনা, কিন্তু সাহস হারাচ্ছি না, তবে মিতব্যয়ী হয়েই চলতে হবে, বলতো যায়না, হাজার হউক বিদেশ বলে কথা)
অপু- (খাবার দোকানি থেকে শুনে এসে) বনগাঁ থেকে ট্রেনে গেলেই হবে, সবাই নাকি ওভাবেই যায়, এখন থেকে বনগাঁ স্টেশনে ২০-২৫ টাকা অটো ভাড়া-
আমরা অটোতে রওয়ানা দিলাম বনগাঁর উদ্দেশ্যে, ওখান থেকে ট্রেনে কলকাতার সেই বিখ্যাত শিলদাহ স্টেশনে যাওয়া যাবে- পথি মধ্যে অটো থেমে গেলো কিন্তু বুঝা গেলো না কেন- ক্ষানিক পরে দেখা গেলো মৌন মিছিল, সবই বয় বৃদ্ধ লোকজন, রাজনৈতিক দলের ব্যানার নিয়ে মিছিল, অবাকই হতে হলো, আমার দেশেও তখন মিছিল আর আন্দোলন একটা নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা- কিন্তু এখানকার মতো নয় বরং ওখানকার মানে বাংলাদেশের মিছিলের বেশীরভাগ জুড়েই থাকে under 18 (non-voter)দের উপস্থিতি, বুঝতে পারলাম, এই দেশটা আমাদের থেকে অনেকটাই আলাদা--।
বনগাঁ স্টেশনে এসে পৌঁছলাম সাড়ে চারটা নাগাদ, কলকাতার ভাড়া ১০-১৫ টাকার মতো ছিলো, খুব একটা ভিড় নেই, সিট পেলাম- বগিও মোটামোটি ফাঁকা, লোকজনের সাথে কথা বলে যা বোঝা গেলো- বিকালের সময় কলকাতা থেকে লোকজন ফেরত আসে, তাই কলকাতার যাওয়ার ট্রেন ফাঁকাই থাকে আর ট্রেনেই যাতায়াতটা বেশি হয় এখানে, লোকাল ট্রেনেই যখন যাচ্ছি- লোকজনের সাথে গল্প করে করে যাচ্ছি- ভালোই লাগছে, গোধূলির রং মিলিয়ে যাওয়ার আগেই যদি কলকাতা পৌঁছে যাই তবে বোধ হয় সম্রাট হোটেলে যেয়ে বন্ধুদের সাথে জম্পেশ আড্ডা দেয়া যাবে- এই আশাতেই বাদাম চিবাতে চিবাতে আর পাতার বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে লোকজনের সাথে কিঞ্চিৎ আড্ডা দিতে দিতেই ট্রেন এগিয়ে চলছে শিয়ালদাহ স্টেশনের উদ্দেশ্যে।
টিকেট যদিও কেটেছি তবুও ভয়ে ছিলাম- যদি TT এসে পাসপোর্ট দেখতে চায়- আমরা তো body pass- তখন কি হবে? ভাগ্য ভালো- TT আসেনি, হয়তো সবাই কলকাতা থেকে ডাউনটাউন আশা ট্রেনেই ব্যাস্ত, যাই হউক, অবশেষে শিয়ালদাহ এসে পৌছুলো আমাদের ট্রেন, এতো মানুষের ভিড়ে নিজেকে যেন কেমন অচেনা লাগছে, তার পরেও দূর থেকে কোনো পুলিশ বা নিরাপত্তা কর্মী চোখে পড়লেই মনে হচ্ছে- তারা যেন আমাদেরই পর্যবেক্ষণ করছে- হাফ ছেড়ে যখন বাচলাম, কলকাতায়তো এসেছি- এবার হোটেল সম্রাট খুঁজে বন্ধুদের সাথে দেখা করা। শুরু হলো পরবর্তী চেলেঞ্জ- কলকাতা শহরে অনুসন্ধান।

পর্ব-৪ : কলকাতায় অনুসন্ধান

খুলনা থেকেই এক বড়ো ভাইয়ের সাহায্যে বন্ধুদের জন্য কলকাতাতে আমিই হোটেল সম্রাটে রুম বুকিং দিয়েছিলাম, মনে আছে যে নিউ মার্কেটের কাছে ধারে কোথাও, কিন্তু ঠিকানাটা নিয়ে আশা হয়নি- হুট্ করে সিদ্ধান্ত, body pass করে চলে আসা, যাই হউক- শিয়ালদাহ থেকে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে বাসে করে নিউমার্কেট এলাকায় আসলাম, তখন রাত প্রায় ৮ টার মতো বেজে গেছে, একটা হোটেলে ঢুকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম- 'দাদা, হোটেল সম্রাটটা কোন দিকে হবে? আমাদের কিছু বন্ধুরা এসেছে, ওদের সাথে দেখা করতে হবে—

রিসেপশন- বলতে পারবো না দাদা

বেশ কয়েকটাতে জিজ্ঞেস করে এক জায়গা থেকে বললো- 'ট্রাভেল এজেন্টদের কাছে জিজ্ঞেস করুন, ওরা বলতে পারবে, ওরা সব হোটেলের খবর রাখে- আসে পাশে ট্রাভেল এজেন্টদের দোকান খুঁজতে যেয়ে দেখি সবগুলোই বন্ধ- ৯টা বেজে গেছে, এখন উপায়?

দূর থেকে ঘোড়ার পীঠে আরোহন করে বসা টহল পুলিশ দেখে মনে হচ্ছে যে আমাদের খুঁজেই বের হয়েছে, 'চোরের মন পুলিশ পুলিশ'- একটা কথা আছে না? আমরা নিজেরা প্রতিজ্ঞা করলাম যে আর কোনোদিন এই উপায়ে আশা যাবে না, মন ছোট হয়ে থাকে, নিজেকে চোর চোর মনে হয়- এর মাঝে হোটেল সম্রাট খুঁজে পাওয়া এই রাতের মিশন থেকে বাদ দিয়ে নিজেদের থাকার জন্য হোটেল খুঁজতে যেয়েতো দেখি মহাবিপদ- যদিও একটা ঠিকানা পকেটে ছিল (খুলনার এক বন্ধু তার চাচার ঠিকানা দিয়েছিলো যেন আমার ক্লাসমেটদের ভারত শিক্ষাসফরে কোনো বিপদ হলে সাহায্যে আসবে), তদুপরি রেশন কার্ড অথবা ভোটার কার্ড থাকা জরুরী- নয়তো ল্যাগেজও নেই, কোনো ভাবেই নিউমার্কেটের আসে পাশে কোনো হোটেলেই থাকার সুযোগ হচ্ছেনা- অতোপ্লর একজন ভদ্রলোক বললেন- 'হাওড়া চলে যাও, ওখানে লজিং পাবে, রাতটা কাটিয়ে দাও, সকালে এসে বন্ধুদের হোটেল খুঁজে বের করো, বেশি রাত হয়ে গেলে হাওড়াতে যাওয়াটাও মুশকিল হয়ে যাবে''- কোথা থেকে কোন বাসে উঠতে হবে, দেখিয়ে দিলে আমরা হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়-

রাত এগারোটার কিছু আগেই হাওড়া পৌঁছে গেলাম, স্টেশনের পাশেই দেখলাম- বেশ অনেকগুলো Lodge আছে, দু একটা ঘুরেই ১০০ রুপীতে এক রুমে বোরো একটা বিছানায় তিনজন থাকার ব্যাবস্থা করে ফেললাম, নাম ঠিকানা বলে দিলাম (কাগজে বন্ধুর দেওয়া ওই ঠিকানা টা)- সবার নামের শেষে বিশ্বাস লাগিয়ে দিলাম- মাসুম বিশ্বাস, অপু বিশ্বাস, শান্ত বিশ্বাস, টাকাটা নিয়ে রেজিস্ট্রিতে নাম এন্ট্রি করার ডাকঘর জিজ্ঞেস করলে আর বলতে পারলুম না-

দাদা- কি হলো, ডাকঘর কোনটা?

আমি- (নিজেরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে) আসলে সত্যি বলতে কি- আমরা ওপর থেকে এসেছি- বন্ধুরা অন্য এক হোটেলে আছে, খুঁজে পাইনি বলে হাওড়াতে আসা।

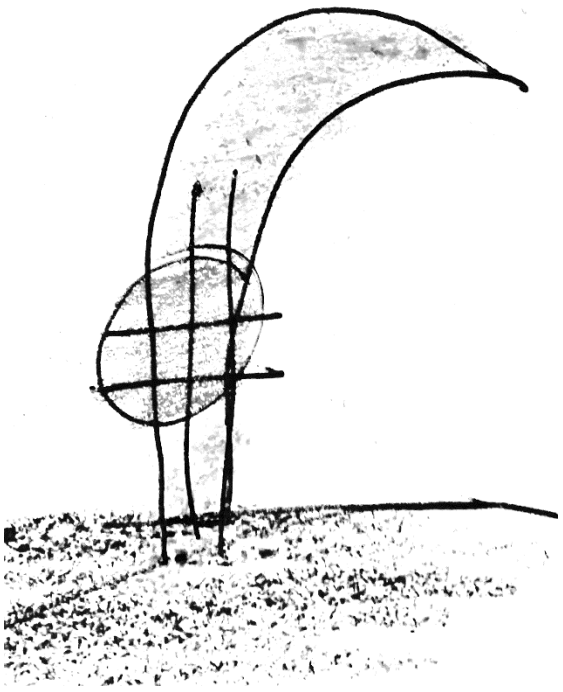

দাদা- বলচকি? তোমরা কচি খোকারা আমাকে বোকা বানিয়ে দিলে? এতো বছরের ব্যবসার জীবনে কেউ আমাকে ধোকা দিতে পারেনি, আর তোমাদের কথা শুনে আমি বুঝতেই পারলুম না? হে ভগবান, কলিকালের ছেলে পুলেরা বুঝি এরকমই হবে! যাই হউক বাপু- বলে যখন ফেলেছি, রাতটা থেকে যাও সকাল ৭ টার ভেতর চলে যেয়ো, ৯ টাতে পুলিশ চেক করতে আসে- মনে থাকে যেনো

আমরা- (মাথা নিচু করে বাধ্য ছেলের মতো) জী আজ্ঞে, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো-

দাদা- ধন্যবাদের দরকার হবে না, কোনো ঝামেলায় ফেলো না বাপু-

চাবি দিলে আমরা রুমে যেয়ে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বের হলাম, পেটের ভেতরে ক্ষুধা চোচো করছে- বাংলাদেশের তুলনায় খাদ্যের দাম অনেক কম, খাবার শেষ করে হাওড়া ব্রিজের রাতের সুন্দর্যটাও উপভোগ করতে কার্পণ্য করিনি আমরা, আগামীকাল কি হবে জানি না, কিন্তু সকাল ৭ টাতে বের হয়ে যেতে হবে এই ভেবেই বিচলিত আমরা ঘুমের পায়তারা করলাম রাত ১ টা দেড়টার দিকে-

'সকালে যখন ক্যাম্পাস থেকে বের হয়েছি, কখনো ভেবেছিলাম রাত কাটাবো কলকাতায়- তাই কাল কি হবে ওইটাও ভেবে কি ফায়দা? ঘুমা- '।

পর্ব-৫ : রথ দেখা কলা বেচা

সকাল হতেই ঘুম থেকে উঠে ভোরের প্রাত্যহিক কার্য সেরে ৭ তার কিছু পরেই Lodge থেকে বের হয়ে নাস্তা করে নিউ মার্কেটের উদ্দেশ্যেই আমরা রওয়ানা দেই- সাড়ে ৯ টার দিকে গ্লোব সিনেমা হলের সামনে এসে দেখি বিশাল লম্বা লাইন, বিশাল পোস্টার- 'Titanic' স্বপ্ন দেখছি না তো? কাল রাতেওতো এদিক দিয়ে গিয়েছি, অন্ধকার বলে হয়তো খেয়াল করা হয়নি, এমন সুযোগতো হাত ছাড়া করা যায় না, Titanic বাংলাদেশে যেতে নূন্যতম ৬ মাস, শান্তকে বললাম-

'তুই লাইনে দাঁড়িয়ে থাক, আমরা হোটেল সম্রাট, খুঁজে বের করি''

বিভিন্ন লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে আমরা একবার এই গলিতে তো আরেকবার ওই গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি মুণ্ডুহীন মুরগির মতো- রবিবার হলো এখানে সাপ্তাহিক ছুটি- মানে শুক্রবার- সবকিছু বন্ধ- হটাৎই একটা ট্রাভেল এজেন্টের দোকানের শাটার অর্ধেক খোলা দেখে মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করলাম-

দাদা, একটু সাহায্য করা যাবে?

দাদা- দাদা, আমরা আজকে বন্ধতো, কালকে আসুন—

আমি- আসলে আমরা একটা হোটেল খুজছিলাম, কেউ ঠিক মতো বলতে পারছেনা, আপনি যেহেতু ট্রাভেল এজেন্ট, ভরসা নিয়েই আপনার কাছে আশা

দাদা- কোন হোটেল?

আমি- হোটেল সম্রাট

দাদা- ও আচ্ছা- একটু দূর আছে, ১০-১৫ মিনিট লেগে যাবে- এখন থেকে সোজা যেয়ে----

বর্ণনাটা অপু মনোযোগ দিয়ে শুনলো আর সমস্ত জটিলতা যতটুকু সম্ভব সরল করে আমরা রওয়ানা হলাম- অবশেষে মিললো সেই অতি আকাঙ্খিত 'হোটেল সম্রাট''

রিসিপশন- কাকে খুঁজছিলেন?

আমরা- বাংলাদেশ থেকে আমাদের বন্ধুরা এসেছে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে- শিক্ষা সফরে—
রিসিপশন- ও হ্যা, রুম নম্বর- ----, আপনাদের বন্ধু?
আমরা- জী হ্যা- বলে রুমের উদ্দেশ্যে
বেশ কয়েকটা রুমের একটিতে নক করলাম- দরজা খুলেই ভূত দেখার মতো চমকে যেয়ে লাফ দিয়ে কয়েক কদম পিছনে যেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার জোগাড়—
'তোরা কোত্থেকে?' বন্ধু Feroz Ahmed বুকে ফু দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে-- এর মধ্যে সবাই বিভিন্ন রুম থেকে ভূতদের দেখতে আসলো-- অবশেষে অবাক হওয়ার গল্প শেষ করে আমরা সবার সাথে সকালের নাস্তার উদ্দেশ্যে বের হলাম, এইদিকে শান্ত কিন্তু এখনও সম্ভবত লাইনেই দাড়িয়ে, Tofayel M Sarower Sumon কে সাথে নিয়ে হুন্ডির ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে গ্লোব সিনেমা হলের সামনে যাই-- (আর চার পাঁচ জন পরেই শান্তর টিকেট কেনার সিরিয়াল)
শান্ত- এই লাইন তো বুধবারের শো-র অ্যাডভান্স টিকেট
আমি- (ঢাকা কলেজের ছাত্র বলে বাটপারি ধান্দা ভালোই জানতাম) ব্যাপার না, Black এ বেঁচে দিবো-
আমরা ওর সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম, একেকজন মোট চারটি টিকেট কিনতে পারবে, আমরা ৪ জনে মোট ১৬ টি টিকেট কিনলাম, যতটুকু মনে পরে ৫০ টাকা করে ৮০০ টাকা খরচ হলো- টিকেটগুলু নিয়ে পাশেই ফুটপাথের এক হকার কে বললাম -- Black এ টিকেট পাওয়া যাবে রে? আজকের ১২টার শো তে-
হকার- (টুকরি নিয়ে প্লাস্টিকের ঘড়ি আর অন্যান্য জিনিস বিক্রি করছে--) দাম একটু বেশি হবে—
আমি- দামের হিসেব পরে করিস, এই যে ১৬ টা টিকেট আছে, ১২ টার শোএর 4 টা টিকেট লাগবে-- আর ১০০০ টাকা লাগবে-- পারলে জোগাড় কর, বাকিটা তোর, (ওর চোখ চক চক করে উঠলো)- টিকেট গুলো নিয়ে চলে যেতে যেতে বলল- দাদা, টুকরিতে একটু দেখে রাইখেন
অপু-শান্ত ওরা বুঝলই না ব্যাপারটা কি হচ্ছে, আমি বললাম- 'দুই ঘন্টার লাইন ধরা, ৮০০ টাকা পুঁজি খাটাইলাম, বিনা পয়সায় Titanic দেখবো আর বিয়ার খাবো এইটা তো আমাদের প্রাপ্য, কি বলিস?' প্রায় ১০-১৫ মিনিট পার হয়ে গেলো, ভাবলাম- ছেলেটাকি টুকরি রেখে পালিয়ে গেলো নাকি? টুকরীতেতো অনেক টাকার মালামালই আছে মনে হচ্ছে, এর মধ্যেই প্রশান্তির একটা হাসি নিয়ে ছেলেটি হাজির- 'দাদা, অনেক গুলো টিকেটতো তাই সময় লেগে গেলো, এই নিন চারটে টিকেট, আর ১০০০ টাকা, চলেন গেটে ঢুকিয়ে দিয়ে আসি, গেটম্যানই ব্যবস্থা করে দিয়েছে, Titanic দেখতে ঢুকে আমি হতবিহ্বল হয়ে ভাবলাম- এটাই বুঝি- 'রথ দেখা আর কলা বেচা'

পর্ব-৬ : কলকাতা - the city of Joy

Titanic দেখে বের হয়ে দেরীতে (সাড়ে তিনটা নাগাদ) দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে সোজা হোটেল সম্রাটে এসে দেখি সবাই প্রস্তুত- ঘুরতে যাবে বলে, আমরাও শামিল হলাম, বেশ কয়েকটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা

সবাই চলে এলাম- Science City- আমাদের দেশেও একটা বিজ্ঞান জাদুঘর ছিল বৈকি, কিন্তু কলকাতার এই নতুন নির্মিত science city র সুনাম সর্বত্র, আমরাও মুগ্ধ হলাম, অনেকে এটাও ভাবতে থাকলো, থিসিস করা যায় যদি বাংলাদেশে একটা science city র একটা প্রকল্প প্রস্তাব করা যায়, অনেক ছবিও তোলা হয়েছে, কিন্তু আমার সংগ্রহে নেই, বন্ধুদের কাছে থাকবে হয়তো- আইসক্রিম খেয়ে ছিলাম, মনে আছে, আরো অনেক স্মৃতি অন্যদের মনে থাকবে- হয়তো ওরা share করবে--

Science City থেকে বের হয়ে আমরা শহরের দিকে ফিরছি, মেয়েরা শপিংএর ইচ্ছা পূরণ করতে চাইলে, এর মধ্যে একজন তো সিনেমা দেখার হিড়িক তুললো- আর আমরা যে এসেই Titanic দেখে ফেলেছি- এতে বেশ কয়েকজন ঈর্ষান্বিত হয়েছে, ছবি দেখার পালা- ৯-১২ শো- খুঁজে ফিরে টিকেট পাওয়া গেলো- 'dil to pagal hai'- মেট্রো সিনেমা হলে রাতের হালকা খাওয়া শেষে আমরা ঢুকে পড়লাম, সিনেমা শেষে আবার খাওয়া দাওয়া করা যাবে, বড় পর্দায় english movie আগেও দেখেছি, কিন্তু বড় পর্দায় হিন্দি ছবি- এতো এক নতুন অভিজ্ঞতা- এতো বড়ো শাহরুখ খান, এতো বড় মাধুরী, আর এত্তো বড় কারিশমা- হাহাহা- সবাই এত্ত বড় হা করেই দেখলাম- খিক !

সিনেমা শেষে বের হয়ে আসার সময় বুঝতে পারলাম- আমাদের দেশের মতো শুধু নিম্নবিত্তদেরই সিনেমা হলে আসার রেওয়াজ কোলকাতাতে নয়, এখানে মদ্ধবিত্ত একটা বড়ো সমাজ আমাদের সাথে ৯-১২ টা শো তে ছবি দেখে বের হয়েছে, জানিয়ে রাখা ভালো যে 'dil to pagol hai' ওই সময়টার খুবই সারা জাগানো ছবি- এক দিনেই পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগতের দুই বৃহত্তম ধারা- hollywood আর bollywood এর সমসাময়িক সবচেয়ে বিখ্যাত দুইটি ছবি দেখে নেশা না করেও নিজেকে নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছিলো, আর ফিরতি পথে একটা বার এ ঢুকে কৃত্রিম নেশাকে হালকা একটু প্রকৃত নেশা দিয়ে পরিপূর্ণতার ইচ্ছে হলো।

আমাদের কয়েকজনের সাথে মেয়েদের দুএকজনও একটু ভিন্ন অভিজ্ঞতার জন্য কিছু একটা খেতে চাইলো- (মূলতঃ নিজের দেশের সামাজিক পিষ্টনে দলিত মেয়ে ক্লাসমেটদের দেখলাম, ভীন্ন দেশে এসে ভিন্ন রূপে নিজেদের প্রকাশ করতে, ওদেরইবা দোষ কোথায়- জীবনে এমন স্বাধীনতা আর কখনো পাবে কি না তারা জানেনা, তাই যতো টুকু সম্ভব- স্বাধীনতার চর্চা টুকু করে নিতে চায় হয়তো- রাত দেড়টা নাগাদ হোটেলে ফিরতে ফিরতে মনে হচ্ছিলো- ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা সম্মন্ধে এতদিন শুনেই আসছিলাম, সত্যিই কি তাহলে তাই-- Calcutta - the city of joy!

পর্ব-৭ : প্রত্যাবর্তন---

দিনটি সোমবার, এতো টুকু মনে আছে, যেহেতু body pass, পাসপোর্টে সিল নাই, তাই তারিখও স্মরণে নাই, সকালে আস্তে আস্তে সবাই ঘুম থেকে উঠে, তৈরী হয়ে- লাগেজ গুছিয়ে প্রস্তুত, কিন্তু আমাদের তিন জনের তো লাগেজ নাই, তাই আমরা শুধু তাদের ব্যস্ততা দেখছি, সবাই নাস্তা করে যাত্রার প্রস্তুতি, আমাদের ক্লাসমেটদের পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক প্রায় এক মাস দীর্ঘ ভারত শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে সবাই প্রস্তুতি নিয়ে

নিয়েছে, আগের দিনেই ফিয়ারলি প্লেস থেকে ট্রেনের টিকেট কেটে আনা হয়েছিল, তাদেরকে ট্রেন স্টেশনের উদ্দেশ্যে বিদায় জানিয়ে সহপাঠীদের সাথে ২৪ ঘন্টার একটি মূল্যবান স্মৃতির সংরক্ষণ করিলাম-

এবার ফেরার পালা, ফিরতে যেয়ে আরো অনেক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হলেও মূল পরিসমাপ্তির ঘটনাটা না বললেই নয়, পেট্রাপোলেতো পৌছুলাম- ওই হোটেলে ঢুকে বললাম-

'ঐপার যাবো, (বুঝলাম যে অনেক দালালই আসে পাশে ঘুরা ঘুড়ি করছে-) আমাদেরকে যে আনলো, পরশু দিন আমাদের এনেছিল, ইমরান নাম তার, বলছিল ফেরার সময় এপারে এসে ওর নাম বললেই ও এসে নিয়ে যাবে'

গোফওয়ালা সর্দার কিসিমের এক দালাল বললো--

'দাদা, টাকা পয়সা দিয়েছিলে তাকে? ইমরান নামে তো কাউকে চিনি না (আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে) এই ওপারে ইমরান নামে কাউকে চিনিস রে?'

আমি- আসার টাকা দিয়েছি, যাওয়ার টাকা ওপারে পৌঁছে দেব, এমনটিই কথা হয়েছিল

সর্দার- তো মাল টাল কি রকম? ল্যাগেজ-পোটলা কই—

আমি- আমরাতো body pass, ছবি দেখতে গেছিলাম, (দেশি ভাষাতেই কথা বলা শুরু করলাম) পরশু গেলাম, কালকে ছবি দেখলাম, আর আজকে চলে এলাম, লাগেজ তাগেজ নাই—

সর্দার- তাহলে দাদা ওর আশায় বসে থেকে কি দরকার, আপনাদেরকে আমরাই ওপারে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, চিন্তার কারণ নেই- দেখুন দাদা, আমাদের আবার যেন কোনো বিপদে ফেলো না দাদা-

আধা ঘন্টা অপেক্ষা করে সীমানা অতিক্রম করার সুযোগ আস, দামাদামি করে তিন জনের জন্য ৩০০ টাকাই ডিল ফাইনাল হয়-

এতটুকু বুঝলাম যে বর্ডার অঞ্চলেও একটা মানদণ্ড আছে আর ইমরান আমাদের বোকা পেয়ে প্রথমেই ঠকিয়ে ছিল, যাই হউক, দেশে তো ফিরতে হবে, ইমরানের শায়েস্তা দেশে গিয়েই প্রথম কাজ, এবার আর এতো গ্রাম ঘুরে পার হতে হয়নি—

এপারে এসেই ইমরানের দোকানে- আমাদের দেখে সেও ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো, আর আমরা ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম-

'তোর না আসার কথা ছিল আজকে? পরে আমাদের নিজেদেরই ধান্দা করে আসতে হলো, শালা- বাটপার" ।

ইমরান- (কাচু মাচু হয়ে) sorry boss, আপনারা বলেছিলেন পরশু দিন আসবেন।

আমি- আজকেই তো পরশু দিন ।

ইমরান- আসলে আপনারা সত্যিসত্যি আজকেই চলে আসবেন এইটা বুঝি নাইক্কা- আমারে আপনারা টাকা দিয়া গেলেও একই অবস্থায় পড়তেন, কিন্তু আপনারা boss বহুত সেয়ানা মাল, আপনারা কৈত্থেইক্কা আইসেন boss, এই লাইন তো বহুদিন, আপনাগো মতন সেয়ানা মাল দেখি নাই।
অপু- আমরা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, কখনো খুলনা আসলে গল্লামারী এসে খানজাহান আলী হলে চলে আসবি। হলের পাশে হোসেনের দোকান আছে, আসলেই আমাদেরকে আড্ডায় পেয়ে যাবি।
শান্ত- সবার সাথে বাটপারি করে পারবি না, ধান্দা-সামালকে ! ভালো থাক, আবার আসলে দেখা হবে--। এখানেই আমাদের ৪৮ ঘন্টার body pass এর সমাপ্তি।
পুনশ্চ, আমি আর অপু আরেকবার সহি তরিকায় কলকাতা যাওয়ার সময় ইমরানের সাথে দেখা করে চা খেয়েছিলাম, সেই ভ্রমণটাও আরেকটা স্মরণীয় গল্প - সেটা নিয়ে আবার ফেরত আসছি-- সবাই সুস্থ থাকুক এই আশায়, আপাতত বিদায়।

- মাসুম, স্থাপত্য ৯৪

List of Registered Alumni as per Google Form Entry

Name	Roll number	Discipline	Location: Country
Golam Morshed	991227	Math	Austria
Muhammad Abu Sayeed	940307	BBA	Denmark
MD Nurul Amin (Babu)	970904	ECE	Denmark
Sharmin Akter	020716	BGE	England
Soubir Titov	990721	BGE	Finland
Seema Ojha	031331	SWE	Finland
Ashiq Mahmood Khan	940125	Arch	Germany
Syed Morshed Kamal	940324	BBA	Germany
Md Sakhawat Abedin	010910	ECE	Germany
Md. Asif Haider Khan	120507	FWT	Germany
Pradip Kumar Sarker	990533	FWT	Germany
Bishawjit Mallick	940404	URP	Germany
Shiuli Pervin	980402	URP	Germany
Mohammad Ruhul Amin	980408	URP	Germany
Md Khurshid Hasan	990430	URP	Germany
Nazmul Huq	000411	URP	Germany
Sujit Kumar Sikder	010428	URP	Germany
Muttasif Hasan Dip	050103	Arch	Germany
Md Saifur Rahman	970522	FWT	Germany
Aaron Firoz	000425	URP	Germany
Md Abdul Muqit Zoarder	020430	URP	Germany
Mahadeb Kumar Das	101220	Math	Italy
Mohummad Aminur Rahman	970702	BGE	Norway
Nusrat Mohua	110103	Arch	Norway
Tawhid Amanullah	910101	Arch	Sweden
Firoj Mahmud (Lincoln)	990714	BGE	Sweden
Nargish Parvin	38 (03)	SWE	Sweden
Masud Parvage	41(02)	SWE	Sweden
Atiqur Rahman	930414	URP	Sweden
Ahme Faruque Ferdous	930421	URP	Sweden
Atta Rabbi	020408	URP	Sweden
Samina Saleh	920111	Arch	Sweden
Tawhid Amanullah	910101	Arch	Sweden
Atal Saha	030604	FMRT	Sweden
Mohammad Abdullah Al Masum	940113	Arch	United Kingdom
Farzana Alam Prova	020728	BGE	United Kingdom
Mazharul Islam	940416	URP	United Kingdom
চৌধুরী জিয়াউর রহমান Togor	920521	FWT	United Kingdom

শেকড়ের টানে

For the Roots

মতামত ও লেখা পাঠানোর ঠিকানা

newsletter@kuin.eu

KUinEu

Khulna UniversityGraduate in Europe

www.kuin.eu